টাকার রং লাল

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

মডার্ণ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস্
৭নং, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ :
১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

প্রকাশক :
প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়
মডার্ণ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশন্স্
৭, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীশরৎ চন্দ্র গুহ
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

কল্যানীয় শ্রীআদিত্যনাথ লিখেছেন "টাকার রং লাল" ঐ পাণ্ডুলিপি দেখে এই বই সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি যে লেখক আজকের ছুনিয়াটাকে চিনেছেন। আদিত্যনাথ জানেন প্রতি মানুষের-ধমনীতে লাল রক্ত বইছে। আর ঐ লাল রক্তকে বজায় রাখতে হোলে চাই টাকা। বইখানি লিখতে বুকের লাল রক্ত সুপ্রচুর খরচা করেছেন লেখক। বাস্তব যে কতখানি নিষ্ঠুর তার প্রমাণ এই "টাকার রং লাল" বইখানি।

কামনা করি শ্রীমানের লেখনী অক্ষয় হোক।

ABADHUTTA
JORAGHAT
P.O.—CHINSURA
Dist—HOOGLY

অবধূত

উৎসর্গ

সহজ-সরল-অনাড়ম্বর দেশপ্রেমিক, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

'টাকার রং লাল' আমার দ্বিতীয় বই।

আমার সবকিছু সাফল্য পরম পূজনীয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক "অবধূত" ও আমার সাহিত্যগুরু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পণ্ডিত মহাশয়ের আশীর্বাদে। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস্-র কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ব্যতীত এত তাড়াতাড়ি "টাকার রং লাল" পাঠকবর্গের নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হতাম না, এ কথা ধ্রুবসত্য। তাঁকে কালির আঁচড়ে কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁহাদের মহত্বকে ছোট করা হবে।

মুদ্রণ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। আশা করি অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের ক্ষমা রসজ্ঞ পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই পাব।

—এই উপন্যাসের সব কয়টি চরিত্র কাল্পনিক।

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

মরণ। জন্মের কারণ।

আশা নিয়ে ভবিষ্যৎ বাঁধার সংকল্পে চিরসমাধি। দুর্মদ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক আর নাই-ই হোক, থাক হৃদয়ে যতই মৌনমূক বেদনা—বর্তমানের জন্য আকুল আর্তনাদ, সব ফেলে যেতে হবে সে কঠিন নির্মম কালো মৃত্যু-বাসরে।

মহা সমাদরে নিয়ে যাবে মহাকাল। বাধা মানবে না। শুনবে না কারও কথা। সে অজানা—অদ্ভুত।

প্রিয়জনের আকুল আর্তনাদ, সজল চোখে শ্রাবণের ধারা, সহস্র স্মৃতির অকারণ স্মরণ, কাল্পনিক ভবিষ্যৎ ভাবনার কলরোল গ্রাহ্য না করে সবার চোখের সামনে থেকে হাসতে হাসতে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য তার।

পৃথিবীতে সবার উচ্চে স্থান তার। এ-এক পরম সত্য শব্দ। শ্রুতিকটু হলেও সর্বপ্রাণী-গ্রাহ্য, আঁতে ঘা মারা কথা—মরণ!

অগ্রাহ্যর অহমিকাময় অন্তরের অস্ফুট শব্দ সে শুনেও শোনে না। পরম ঘৃণাভরে তার বাণী সর্বজন গ্রাহ্য করতে করতে সেই মহাকাল চলতে শুরু করেছে কোন আদিম কাল থেকে। থামছে না, থামবে না কোনদিন। বড় জোর পরমায়ু বাড়িয়ে দিতে পারে প্রয়োজন বোধ করলে। কিন্তু পরম ঘৃণার পরাকাষ্ঠা সে দেখাবেই অর্থাৎ তার ঐতিহ্য বজায় রাখবেই।

সব একদিক, মৃত্যু একদিক। তবু সে জিতছে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত নির্ধারিত জয়োল্লাসে লাল জবার মত লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বালিয়ে রেখে লক-লকে শাণিত জিভটাকে উন্মত্ত লেলিহান শিখার জ্বলন্ত প্রতীকের সদা জাগ্রত প্রহরী যেন সে।

ফাঁকি দেবার উপায় নেই তার দৃষ্টিকে। পলক বিহীন সে স্বচ্ছ দৃষ্টি সার্চ-লাইটের মত অত্যন্ত কড়া। বজ্র কঠিন বাহু দুটো বাহাত্তুরে বুড়ো থেকে আতুর ঘরে সদ্য প্রসূত বার সেকেণ্ডের শিশুকেও দেয় না রেহাই। অর্থাৎ তার কাররারে ঘুষ নেই, ভেজাল নেই—ফলাও কারবার।

নির্ভেজাল সে কারবার ফলাও করে বিজ্ঞাপনের নিয়ন লাইটের কৃপায় বা মহাশক্তিশালী সুললিত ভাব ভাষায় জাদুস্পর্শে মোহিত করবারও প্রয়োজন নেই কাউকে।

অতএব মরণ ধ্রুবসত্য।

তার যাত্রাপথ সত্য। সত্য তার নাম-মহিমা। তুলনা-বিহীন তকমাধারী বিশিষ্ট সেবাব্রতী যেন সে।

তুলনা ও উপমার ধার ধারে না সে সেবাব্রতী। নিষ্ঠুর নিয়তির পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য। একেবারে খাঁটি ও নির্ভেজাল। বিশ্বজোড়া তার খেলা চলেছে অবিরাম। তোয়াক্কা করে না কারো সমালোচনার, কেননা কারো ত পরিত্রাণ নেই মৃত্যুর হাত থেকে।

এদিকে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষ তার কাছে পরাজিত। সবার পরাজয়, সুতরাং লজ্জার কিছু নেই। সুললিত লজ্জার শাখা লবঙ্গ-লতিকার ন্যায় ললাটে ধারণ করে সব মানুষ এক সূত্রে গাঁথা। এতটুকু এদিক ওদিক হবার যো নেই।

মরণের বিপরীত দিক জন্ম।

জন্মের পর আসে কর্মের স্থান। পৃথিবীর বুক মসৃণ সমতল তুলতুলে জাজিমের মত নয়, দুর্গম যন্ত্রণার্ত বিশাল পৃথিবীর বুকে মানুষকে অহরহ যুদ্ধ করে আগিয়ে যেতে হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হানাহানির প্রবল প্রতাপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করাও মানুষের ধর্মে সয় না, তাই অহর্নিশি চলেছে আশা আর আশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তার চলার পথ সুগম করবার প্রয়াস। অর্থাৎ নতুন স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতের রক্তিম চূড়ার দিকে তার তীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টি। কল্পনার

আলোকিত জীবনের নতুন আশ্বাসের ভৈরবী সংগীত। হৃদয় মন্দিরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে সে এক মধুর স্বরে একাকী একতারা বাজাচ্ছে। কখনও আশা কখনও নিরাশার ছবি পর পর চলচ্চিত্রের ন্যায় হৃদয় গুহায় দেখাচ্ছে নির্ভয় ও ভয়ের স্বরূপ। মানুষ টলছে আবার টলতে টলতে সামলাচ্ছে। অনন্ত কাল থেকে তাই চলেছে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা আর টানা পোড়েনের খেলায় খেলোয়াড় হয়ে দিগ্ ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে বেড়ানো। ছুটছে—অবিরত ছুটছে। আর ভাবছে।

সাধারণতঃ মানুষ ভাবে এক একটা দিক। কেউ পৃথিবীর কথা, কেউ দেশের কথা, কেউ বা নিজের কথা। ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তায় তলিয়ে যাচ্ছে—তবু ভাবছে। ভাবাটাই তার কাছে সাধনা। ভেবেই তার আনন্দ। ভাবনার একটা কিনারা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।—ভাবনা চাই।

ব্যক্তিগত ভাবনাটাই আজকের মানুষের মনে প্রবল। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তেমন কেউ ভাবে না—আত্মকেন্দ্রিক সুখাভিলাষই প্রধান কাম্য। তা'হলে পৃথিবীর এত দুর্দশা কেন হবে? কেন এ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে না স্বর্গরাজ্য, কেন তার জন্য পাড়ি দিতে হবে ঘরের রাজ্য ফেলে অন্য রাজ্যে?

উপাধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলেও মুকুল সর্বাধিকারী মশাই নিজেকে তাই মনে করতেন। ধন-মান-গর্ব-অহঙ্কারের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন তিনি সুতরাং তার ওপর কার কি বলবার আছে? আর বললেই বা তিনি শুনবেন কেন—তিনি না লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক?

কালবাজারের দৌলতে তিনি প্রচুর টাকাকড়ি অন্যায় ভাবে উপার্জন করেছিলেন। ভাবেননি দরিদ্রের রক্ত চুষেই তাঁর এ রোজগার। আর বটেও ত, সে ভাবনা ভাবলে আর অর্থ রোজগার হয় না? তাই রাত দিন ছিল তাঁর অর্থোপার্জনের অন্ধিসন্ধির পথ

আবিষ্কার এবং তার মোক্ষম প্রয়োগ এবং সময় সময় আইনে ধরা না পড়বার গলি ঘুঁজি আবিষ্কার।

ইদানীং তিনি অনুতাপ ভোগ করছিলেন, কিন্তু মরতে চাননি। তবু তাঁকে মরতে হলো, রেহাই পেলেন না মরণের কাছে, হঠাৎ এসে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেল মহাকাল।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ছ'মাস আগে পর্যন্ত নানাবিধ বিপদ থেকে রেহাই, অখণ্ড পরমায়ুর জন্য তিনি করেন নি এমন কাজ নেই। মাসে একবার করে বিখ্যাত জ্যোতিষীদের দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার, নানাবিধ বহুমূল্য কবচ-পাথর ধারণ এবং বার বার যাগযজ্ঞের জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছেন।

মহাশক্তিশালী মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বাঁচাতে পারলে না সর্বাধিকারী মশাইকে। অর্থাৎ তাঁর সর্বাঙ্গে মেশানো কালবাজারী প্রসিদ্ধ দেহ-মনটা আর চাঙ্গা হয়ে উঠলো না।

॥ দুই ॥

স্ত্রী-পুত্র শেষ বিদায় দিলেন সর্বাধিকারীকে।

বিদায়ের ঘটা রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ। বড় ঘরের বড় কথা। সুতরাং কেউ বিস্মিত না হয়ে বরং সাগ্রহে শেষের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সর্বাধিকারীর বিপুল নশ্বর দেহ সাধারণ মানুষের বহনোপযোগী নয়, তাই দেহখানা সুশোভিত হলো একখানা ট্রাকে। পূর্বেই ট্রাকখানা সাজানো হয়েছিলো নানা ফলফুলের লতাপাতা এবং বিবিধ ফুলের মালা দিয়ে। আলোকমালায় সুসজ্জিত মৃত সর্বাধিকারী যে কোথায় যাচ্ছেন তা' সর্বসাধারণকে জানাবার উদ্দেশে আগে-পিছে ছিল ট্রাক ভর্তি হরিনাম সংকীর্তন দল আর দুপাশে শবানুগামীর দল।

মুহূর্তে ধূপ-দীপ আতরের গন্ধে পথ বিমোহিত হয়ে উঠলো। হতচকিত হয়ে উঠলো পথচারীরা।

যারা সর্বাধিকারীর গুণমুগ্ধ তাদের মধ্যে কেউ বললে, 'একজন দিকপাল গেলেন', কেউ বললে, 'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো'। যারা শত্রু, তারা আড়ালে বলাবলি করলে, 'বাঁচা গেল, মূর্তিমান পাপ বিদায় হলো'।

সে সময় লোকসভার অধিবেশন চলছিলো। সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে যারা খবর শুনেছেন বা পরদিন সংবাদ-পত্র পড়েছেন নিশ্চয় সর্বাধিকারী মশাইয়ের আত্মার প্রতি সম্মানার্থে সভায় দু'মিনিট দাঁড়িয়ে মৌনতা পালন এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর কথা সংক্ষেপে জানতে পেরেছেন। যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ক'দিন পর অসংখ্য সর্বাধিকারী মশাইয়ের গুণমুগ্ধ বন্ধুর শোকজ্ঞাপনের উত্তরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সবিনয় পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার এবং শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হ'বার সানুনয় প্রার্থনা। আমরা জানি, যদিও পরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র যথাযোগ্য

পাত্রে যথাসময়ে বিলি বন্দোবস্ত হয়েছিলো। বেশ কিছু গাড়ী বিশেষ অতিথিদের আনবার জন্য সকাল থেকে ছোটাছুটি করছিল। অন্ততঃ বিশটা বিশেষ ব্যক্তি তুবড়ির মত ছুটে বেড়াচ্ছিলো ঘরে বাইের।

যাক্ সে কথা!

মৃতদেহ সৎকার হলো সগৌরবে। জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মিনিট পাঁচেকের জন্য একজন প্রাদেশিক উপমন্ত্রীর উপস্থিতি আরও শোভাবর্দ্ধন করলো শ্মশানের।

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই জানলে, সর্বাধিকারী মশাই মরার মত মরেছেন, সুতরাং একটা কাজের মত কাজ হবে। কাজ করে নাম পাবে তাঁর একমাত্র পুত্র রামগোপাল সর্বাধিকারী, ধনী ব্যবসায়ী মহলেও বাহবা পাবে। এক-সূত্রে গেঁথে নেবেন তাঁরা। চাই কি, পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করলে এম. এ. পাস করার পর ডক্টরেটের যে সম্মান সেরকম সম্মানও পাবে বিভিন্ন মহলে। অতএব সে পিতার শূন্যস্থান পূরণার্থে উঠে পড়ে লাগবে, এ আর বেশী কথা কি?

মৃতদেহ সৎকার করতে খরচ হলো সাড়ে তিন হাজার টাকা। বলা বাহুল্য হাজার টাকার চন্দন কাঠ আর পাঁচশো টাকা নেশা ভাঙ্ স্ফূর্তির জন্য খরচ হলো শুধু।

চন্দন কাঠের চিতায় পুড়লে মানুষ কোন্ লোকে যায় জানি না, তবে ধনীর ঘরে সে রেওয়াজ আছে অর্থাৎ চন্দন কাঠের চিতায় পুড়ে মরবার মত সামর্থ্য আছে তাই তারা পোড়ে। হায়! দরিদ্রের পুড়ে মরবার মত কাঠও জোটে না। তবে শবদাহ মাত্রই দু'-পাঁচজন নেশাখোরের আবদার মেটাতে হয়, তা' না হলে কাজ হয় না। শ্মশান-বন্ধু বলে মানায়ও না যে—যেমন উগ্র কাজ তেমনি উগ্র নেশা করা চাই ত! তাছাড়া অমন একটা মানুষের মৃত্যুতে শ্মশানে হুল্লোড় হবে না?

সুযোগ বুঝে, যারা চালাক চতুর বন্ধু তারা শ্মশানেই টিপে দেখলে রামগোপালকে। বুঝলে, নাচালে নাচবে।

রামগোপাল দিলদরিয়া তখন। যার যা' আবদার মেটাচ্ছে বেশ খুশী হয়ে। মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, 'আহা, বাবা চলে গেলেন—কিভাবে যে সবদিক সামলে উঠবো।'

সাহস দিলে বন্ধু-বান্ধব ও পিতৃবন্ধুরা। তার কোন চিন্তা নেই। তারা প্রাণটুকু ছাড়া বাকী সব দিয়ে সাহায্য করবে তাকে। আজকের মানুষ সব পারে, পারে না শুধু মৃতে প্রাণ দান করতে, সুতরাং সর্বাধিকারীর মৃত্যুর জন্য তার এতখানা ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

একজন পিতৃবন্ধু আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ্যেই রামগোপালের কজন যুবক বন্ধুকে বললেন, 'বাবাজীকে সামলাও তোমরা, আমরা ওদিকটা সামলাচ্ছি—' বলেই তিনি শ্মশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, 'চিতা যা' জ্বলছে, আহা—পুণ্যাত্মা মানুষ—' বলেই তিনি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন-হরি হে, দীনবন্ধু!

বাবাজী কিছুক্ষণ আগে ক'-আউন্স ইম্পিরিয়্যাল ক্রাউন আর গোটা ছয়েক সেদ্ধ ডিম শেষ করেছে, এটা নাকি সে কলেজ-লাইফ থেকেই শুরু করেছে। যেহেতু তেমন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে এবং কচি দেহমনে অহরহ একটা খুশীর আমেজ রাখতে হলে এটা নাকি অপরিহার্য। দেহে ভেজাল না দিলে মনে ভেজাল আসবে কেন! বিশেষভাবে, এমন পরিবারে?

সামনে গোল্ডফ্ল্যাক সিগারেটের কৌটোটা খোলাই ছিল। বাবাজী নাকি চেইনস্ স্মোকার। ফের একটা ধরিয়ে কা'কে যেন বললে, 'বড় অনুতাপ যে বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না; ষাট বছর বয়স এমন বেশী কি? সেদিন কাগজে দেখলাম, আমাদের দেশের এক বৃদ্ধা একশো আট বছর বয়সে বেশ বেঁচে আছেন, রাশিয়াতে নাকি 'লংজিবিটি' আরো বেশী।'

আর একটা ইম্পিরিয়্যাল ক্রাউনের বোতল খুলে গেলাসে খানিকটা ঢেলে কে যেন সামনে ধরলে বাবাজীর।

বাবাজী বিনা দ্বিধায় পান করে এবার মনের ঝাঁপি খুললে, 'তোমরাই বল—এ দুঃসময়ে লীনার ডিভোর্স কেস ষ্টার্ট করা কি ঠিক হয়েছে? একদিকে আমি বাবাকে নিয়ে শশব্যস্ত, আর তুই কোন আক্কেলে বাপের বাড়ী গিয়ে কেস ফাইল করলি? হুঁ, ব্যারিষ্টার বাপের গুমরে মলো—আমি চরিত্রহীন মাতাল, এ প্রমাণ তুই কি করবি?—নিজেই আদালতে স্বীকার করবো। কেন, লীনার বাবা মদ খান না, সপ্তাহে একদিন করে গ্রাণ্ড হোটেলে যান না? তাতে তাঁর কোন অসম্মান হয়েছে, না ব্যারিষ্টারী মন্দা যাচ্ছে? আর একথা যদি আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে না পারি ত—' মাথা ঝাঁকড়ে এবার সে বলে, 'তা' হলে আমার শাশুড়ীকে ত ডিভোর্স কেস করতে হত আগেই—হুঁ, আভিজাত্যের মুখে ঝাড়ু মারো।'

বন্ধুরা সবাই এক বাক্যে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আরে তুমি রাজী থাকলে বলো না শ্মশানেই তোমার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে তুলব! সর্বাধিকারী মশাইয়ের ছেলে বিয়ে করতে রাজী থাকলে লীনার মত আই. এ. পাস নয়, কত বি. এ., এম. এ. পাস মেয়ের বাপ তোমার পায়ে গড়াগড়ি দেবে! এইত কেস ষ্টার্ট হয়েছে শুনেই কত ভদ্রলোক তোমাকে কন্যাদান করবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। লীনা লীন হয়ে যাক তোমার মন থেকে। তবে আমরা যেটুকু জানি, আসল কথা নাকি, তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে কোন এক সিনেমা-আর্টিষ্টকে সে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলো…বাপের নাকি তাতে ঘোর আপত্তি ছিলো, তাই ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো—এখন মন ফের উড়ু উড়ু করছে, তাই নানারকম গলদ দেখিয়ে ডিভোর্স কেস করা। ফুঃ…

লীনার কাকা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের কথাবার্তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বুঝে আগিয়ে এসে বলেন, 'ছি ছি

বাবাজী, এসময় ওসব কথা কেন? তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি লীনা কেমন মেয়ে? পরের মুখে বাজে কথা শুনে শ্মশানে কেন তড়পাচ্ছো? নিজের ঘরের কেলেঙ্কারী এভাবে প্রকাশ করার কি কোন বাহাদুরী আছে? তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, যেমন লীনা, তেমনি তার বাবা। অমন মানুষ এ-যুগে খুব কমই মেলে।—উঠে গিয়ে দেখোগে, চিতার পাশে বাপ মেয়েতে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। লীনা ত তার শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শুনে থেকে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, শ্মশানেও ত্ব'বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল'।

'তবে কেস করেছে কেন মশাই? কেসটা তেমন জমবে না বুঝে বাপ মেয়েতে সময় বুঝে এখানে এসেছেন বুঝি?'

'সব কথা তোমাকে এখানে বলা উচিত নয় বাবাজী, তবে না বললে তোমার বন্ধুরা অন্যরকম ধারণা করতে পারেন তাই এবার আমাকে আসল কথাটা বলতে হল। তোমাকে সংশোধনের জন্যে তোমার বাবার পরামর্শতেই ডিভোর্স কেস করা হয়েছে—মান ইজ্জতের ভয়ে যদি তোমার চরিত্রের সংশোধন হয়, তাই। কিন্তু আজ ত তোমার বাবা বেঁচে নেই, সবদিক সামলানো দায় হবে, এসব চিন্তা করেই—'

'ব্যারিষ্টারী চাল আমি বুঝি খুড়োমশাই, আমি মুকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—ওসব ছেলে ভুলানো কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না।—আমি যে কি 'চীজ' তা' বুঝতে জানতে আপনাদের বহু দেরি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—'।

আমার কথা বিশ্বাস কর বাবাজী, তোমার মা'-ও একথা জানেন। তা'ছাড়া তোমার সন্তান লীনার গর্ভে, এসময় কেস করবার সময়ও নয়। বেশী ঘাঁটিয়ো না, তোমার বাবার হাতের লেখা চিঠিও আছে আমাদের কাছে।

লীনা কাছে এসেছে তখন। ভিজে গলায় বলে, 'বিশ্বাস কর

সব সত্যি, মরণ যেমন সত্যি তেমনি এসবও।—পরে তোমাকে সব খুলে বলবো।'

'শ্মশান নয় যেন ষ্টেজ'—দূর থেকে কে যেন বলে।

রামগোপাল ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়, 'জীবনটাই অভিনয় দাদা, ভেবে দেখলে, না—মনে হবে না'। এবার লীনার দিকে চেয়ে বলে, 'এসো লীনা, আমরা আবার সংসার পাতিগে সুখে স্বচ্ছন্দে,—ভুলে যাও অতীতের কথা। তা'ছাড়া জন্ম হলেই মৃত্যু আছে। সেজন্য আকুল হলে চলবে না। আমাদের বাঁচতে হবে, তারপর বাবার মতই একদিন আসতে হবে শ্মশানে। মরণ ধ্রুবসত্য—মরণ অজেয়। —তুমি কি তা' বিশ্বাস কর না ?'

ধরা গলায় লীনা বলে, 'করি বই কি। চলো, ওদিকের কাজ সারা হয়েছে, আমরা স্নান করে বাড়ী ফিরে যাই। তোমার জামা কাপড় আমার সঙ্গেই আছে।'

রামগোপালের বন্ধুরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে, একি বহুরূপী না ধূলো পড়া সাপ ?

॥ তিন ॥

অখণ্ড পরমায়ুর স্বত্বাধিকার নিয়ে মানুষ জন্মেছে এ তার কপট ধারণা। কিন্তু মানুষ বুঝেও বুঝতে চায় না, সে জন্মের দিনই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে এসেছে। এসেছে তার পরমায়ুর দণ্ড-পল-অনুপলের নির্ভুল হিসাবের নিশান হাতে করে।—সময় হলেই যেতে হবে সে অনন্ত লোকে। মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হোক আর নাই-ই হোক।

প্রভাত সূর্য যখন রক্তিম আভায় পূবের আকাশের কোলে আবীর ছড়িয়ে দেয়, আঁধার লজ্জায় মুখ লুকায়। আবার যখন অস্ত যায় প্রভাত-সূর্য, আঁধার এসে জাঁকিয়ে বসে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলেছে তাই আলো আঁধারের মত জনম-মরণের চক্রাকার খেলা। অবিরত বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে।

জন্ম থেকেই মানুষ মৃত্যুর দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে নানা খেলায় মত্ত হচ্ছে। হাসি-কান্না ভরা এ পৃথিবী যেন তাকে নিত্য নতুন আলেয়ার মরু সাগরে স্নান করাচ্ছে। যদিও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কোটি কোটি মানুষের চরণ স্পর্শে এ ধরণী ধন্য। পাহাড়-নদী-অরণ্য-রাজপথ তার ইতিহাস জানে এবং মিছিলও চলেছে তাই বহুদিন থেকে। তবুও বিচিত্র এ-মিছিলের চরিত্র, চলমান আলেখ্য বৈচিত্র্য প্রতিটি ধূলিকণাও যেন বিস্মিত হয়, মানুষ কিন্তু বিস্মিত হয় না। মানুষের কাছে পরম বিস্ময় মৃত্যু। একটা অবিস্মরণীয় এবং অবর্ণনীয় আতঙ্ক।

বিধাতার কি অদ্ভুত ইঙ্গিত। অথচ মানুষ জন্ম থেকেই সহজ সত্য পথ মেনে নেয় না। সহজ-সত্য-অনাড়ম্বর জীবন যাপনে মানুষের বুঝি শান্তি নেই—বৈচিত্র্য না থাকলে জীবনই বুঝি বৃথা। —আশ্চর্য, আলেয়ার পিছে মানুষ ছুটছে, ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে যাচ্ছে—তবু ছুটছে, ছুটেই তার শান্তি। আত্ম অহমিকা—অখণ্ড

পরমায়ুর অধিকারী হয়েছে সে জন্ম থেকে—এ অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে তার মায়ামৃগের পিছে নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন। “সোনার হরিণ চাই।”

মুকুল সর্বাধিকারী মশাই অবশ্য জন্ম থেকেই ধন-মান-যশের অধিকারী ছিলেন না। ছলে বলে কৌশলে তিনি সেসব অধিকার করেছিলেন। দরিদ্র-দুর্বল মানুষ যারা তারা বলেছিলো ‘ভাগ্য’, আর যাদের চোখ টাটিয়েছিলো তারা আড়ালে বলাবলি করেছিলো, ‘সব অধর্ম আর মুরুব্বির জোরে’। সহজ সত্য পথে চললে মানুষের চলে যেতে পারে,কিন্তু এতখানা হতে পারে না,অধর্মের আশ্রয় বিনা।

মুকুল সর্বাধিকারী সদম্ভে বলতেন, ‘এ বাহু দুটোর জোর আর মাথা খাটাতে পারলে সব হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে। তার সঙ্গে চাই ভাগ্যের প্রসন্নতা আর অবিচলিত সাহস।

অবশ্য অস্বীকার করা যায় না তার সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কথা, যদিও প্রচুর বাধা বিপত্তির মধ্যে তাকে তাল সামলাতে হয়েছে। বালিগঞ্জের বিরাট বিরাট সৌধের পাশে যখন তাঁর আধুনিক ছকের বাড়ীখানা আকাশ-ছোঁয়া আশা নিয়ে হুহু করে বেড়ে ফুল-ফলগাছ থেকে যেখানে যেমন-টির প্রয়োজন সেসব স্থাপিত হয়ে তাক লাগিয়ে দিলে প্রতিবেশীদের, সে সময় তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আড়ালে মুচকে হেসেছিলেন, সবার অলক্ষ্যে বুকখানাও স্ফীত হয়ে উঠেছিলো গর্বে, তাঁর দীর্ঘদিনের একটা মস্ত বড় কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। যা চেয়েছেন তা প্রায়ই পেয়েছেন।

আশা আর আশ্বাসে বিশ্বাসী মুকুলের হৃদয়ে ছিল আরও অনেক আশা। স্বপ্নের মাধুরী মাখা মনের কোণে সেগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধীরে ধীরে করতলগত করতে হবে কামনা-বাসনা।—ছকে বাঁধা হাসি, মেপে মেপে কথা বলা তার দীর্ঘদিনের মক্সো করা, সেসবের মোক্ষম প্রয়োগে সব সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ করতে হবে। ধৈর্য ধরে পুষিয়ে নিতে হবে তার কাম্যবস্তু। এ তার চাই-ই চাই।

অতবড় ইমারত দেখে চোখ টাটিয়েছিলো অনেকের। তাই এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে খবরও গিয়েছিলো তড়িঘড়ি।

মৃত্যুবাণ !

তদন্তের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন মুকুল। তার কুটিল কালো শয়তানী চোখ দুটো প্রথমটা টাল খেয়ে গিয়েছিলো। দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপর কিছুক্ষন সামলে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার সোমের কাছে।

মিষ্টার সোম বছরে বহু টাকা পান মুকুলের কাছে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এবং নানা ফন্দি ফিকিরের পরামর্শ দিয়ে। এবারও পরামর্শ দিলেন কিভাবে তিনি উতরে যাবেন এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি থেকে। অথচ-তার কেশাগ্রও স্পর্শ হবেনা।

আইন আর রীতির ধার ধারেন না মুকুল। কিভাবে টাকার জোরে সব উলটে দেওয়া যায় তিনি জানেন। অসল কথা এ বিপদ থেকে উদ্ধার না পেলে তিনি সম্মান বাঁচাবেন কি করে? কি ভাবে আশায় আশায় জিইয়ে রাখা হৃদয়ের কামনা বাসনা পরিপূর্ণ হবে?

মিষ্টার সোমকে মোটা টাকা 'ফি' দিয়ে সগু কেনা নতুন মডেলের গাড়ীখানা জোর স্পীডে চালিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরেছিলেন মুকুল। তিনজন সি, এ সাতদিন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্তাদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন মোটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে। মাভৈঃ।

মুকুলের সামান্য বিদ্যে-বুদ্ধি আজ বেড়ে গেছে অনেক খানি। তিনিই বাড়িয়েছেন ঠকতে ঠকতে। এ না হলে কেমন করে সবদিক বজায় রাখবেন তিনি? পরস্পর-প্রতারণা করার যুগ এটা। সুতরাং তীক্ষ্ণ প্যাঁচালো বুদ্ধির প্রয়োজন। প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন তিনি সবার অলক্ষ্যে, গোপনে পড়াশোনা করে। কাউকে জানতে দিতেন না বা ধরাও পড়েন নি তিনি সামান্য বিদ্যের মানুষ।

॥ চার ॥

তৈরী কাগজপত্রগুলো চোখ বুলিয়ে মনোমত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করছিলেন তিনি সেসময়।

গভীর রাত্রি তখন।

চিন্তিত মুখে উঠে এসেছিলেন পারুল সর্বাধিকারী। তাঁর স্ত্রী। মুখ চোখে ঘুমের ছায়া।

খুঁটিনাটি ভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন মুকুল। সেসময় তিনি ডুবে গেছেন গভীরে। সে-গভীরতার পরি-মাপ পারুলের দ্বারা সম্ভব নয়। রাত ন'টা থেকে একটা পর্যন্ত তিনি একটি বারও ওঠেন নি। চাকর চা দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, তিনি কখনও খেয়েছেন কখনও খান নি। অনবরত টেনেছেন কড়া চুরুট। কাউকে বিশ্বাস নেই, কারও যোগ-বিয়োগ সঠিক বলে গর্ব করার নেই, অতি বড় বিজ্ঞেরও ভুল হয়। তাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। এসব চিন্তা করেই তিনি কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। গোপনীয় কাগজপত্র সব বাক্সবন্দী করে রেখে এসেছেন এক বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। সময় থাকতে সাবধান, তবু মনটা অস্থির হয়ে আছে।

পারুল অধৈর্য হয়ে ওঠেন।—'শোবে চলো কত রাত হয়েছে!'—ঘুম জড়ানো কণ্ঠ তার।

কথাগুলো কানে যায় না মুকুলের। ফের একটা খাতার পাতা উলটে দেখতে থাকেন। জমা ও খরচের সঠিক হিসাব বজায় আছে কিনা, থাকলেও তা' বাস্তবের সঙ্গে কতখানি মিল সেসব চিন্তা করতে থাকেন। মনের দর্পণে হৃদয়ের জোরালো সমর্থনে মিলিয়ে নিতে চান। যেন তিনি পরাজিত না হন, ধরা না পড়েন আইনের প্যাঁচে।

ফের একটা চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন মুকুল।

বিরক্তির ঝাঁজ প্রকাশ করেন পারুল দেবী।—'ঘরখানা কড়া চুরুটের গন্ধে ভরপুর, চলো শোবে—রাত হয়েছে অনেক—কি করছো তুমি ছাইপাঁশ হিসেব-নিকেশ!'

মুখ তুলে মুকুল এবার পারুলের দিকে তাকান। বলেন—'এ অগ্নি পরীক্ষার সময় এরকম ব্যবহার আশা করিনি তোমার কাছে?'

ভয় পেয়ে যান পারুল। মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, 'এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে না?'

বজ্রকঠিন কণ্ঠে মুকুল বলেন, 'না! কেন কাজের সময় বিরক্ত করো? খাওয়া শোওয়া ছাড়া মুকুল সর্বাধিকারীকে আরও অনেক কাজ করতে হয়—অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। ভুলে যাচ্ছো কেন—তা' যদি না করতাম, বালীগঞ্জের এ-সৌধ আমার স্বপ্নেই থেকে যেতো, বাস্তবে পরিণত করতে পারতাম না কোনদিন। এত টাকার মালিকও হতে পারতাম না।'

'এত সব ঝামেলায় দরকার কি বাপু, তার চেয়ে সুখ শান্তি অনেক ভাল। এর চেয়ে নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীটাই ছিল ভাল।'

'হুঁ—বসো সামনের চেয়ারখানায়, আর দশ মিনিট মাত্র।' আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান মুকুল।

ভীত ভাবে চেয়ারে বসেন পারুল। বুঝতে পারে না সে এভাবে তাকে বসতে বলার অর্থ কি! কেনই-বা বসতে বললে—কোনদিন ত তাকে এ-রকম গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে না। তবে—?

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মুকুল বললে, 'নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীর কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, অতসব হাঙ্গামার চেয়ে তাই ভাল নয় কি? অন্ততঃ সে সুখের ছিলো—শান্তির ছিলো, আমার মতে!'

'হাঙ্গামা যদি না করতাম, আজ গ্রামের সে মেঠো বাড়ী ছেড়ে কোলকাতায় আসবার কল্পনাও কি করতে পারতাম কোনদিন? তুমিও

আমায় ভালবেসেছিলে আমার হাঙ্গামার জন্যেই—সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বালীগঞ্জের লেক থেকেই আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে আমার অর্থ দেখেই, তাই না ?—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা উঠতেই কেন তোমার বাবা 'না—না' করে উঠেছিলেন, জান ? কিন্তু আমি জানি, সে আমার দারিদ্রের জন্যই ! তারপর এক দরিদ্র ঘরের মেয়ে শ্যামলী এলো আমার জীবনে। পাঁচটা বছর যুদ্ধ করলে আমার সাংসারিক দারিদ্রের সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পেলে না একবিন্দু, তারপর একদিন বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে, সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। রেখে গেল পতিব্রতার চিহ্ন, আমার বিপদ-আপদের প্রাণদানের সঙ্গিনীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন হাসিমুখে। সে কোনদিন হার মানলে না, আমার দারিদ্র, আমার অক্ষমতার কথা মনেও ঠাঁই দিলে না। আজও আমার মনে পড়ে, চোখের সামনে ভাসে তার মধুর হাসি, তার সান্ত্বনার বাণী আজও আমার কানে বাজে পারুল। তাই মনে হয় বিপদে যে ধৈর্য ধরে স্বামীর বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে সব দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করলে তার অদৃষ্টে কেন সুখভোগ হল না ? জানো পারুল, জগতে আসল-নকলের পার্থক্য কি জান, আসল ফাঁক ও ফাঁকি জানে না, কিন্তু নকল ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজে— তার সবেতেই ভেজাল। আমি জানি ভাল ভাবে ভেজাল কাকে বলে, যেহেতু আমি ভেজাল নিয়ে কারবার করি। অনেক তফাত পারুল, শ্যামলীর সঙ্গে তোমার অনেক তফাত। হোক না সে দরিদ্রের মেয়ে, তবু সে তোমার চেয়ে অনেক বড়। তার স্থান অনেক উচ্চে !'

'আমি কিন্তু তোমাকে সেভাবে একথা বলিনি। তুমি বিশ্বাস কর—' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন পারুল।

'চুপ কর, ন্যাকামি রাখ—আর কোন কথা বলে আমাকে বিরক্ত কর না। যদি বাড়াবাড়ি কর, দেখেছো—' বলে দেওয়ালে ঝুলানো রিভলভারটার দিকে একটা আঙুল দেখাল মুকুল।

'সেই ভাল, শেষ করে দাও আমার এ ধিক্কৃত জীবনটা। সবার অলক্ষ্যে এখানে রয়েছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, গ্রামের লোক আজও আমার কথা নিয়ে কুৎসা রটায়, আমার দাদা-ভাই-বোনদের খোঁটা শুনতে হয়।' ছিঃ ছিঃ কি করেছি আমি ?

হঠাৎ প্রচণ্ড রবে হেসে ওঠেন মুকুল। 'একদিন যারা আমায় বিদ্রূপ করেছে আজ তাদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি। কিন্তু কেন জান, তাদের আভিজাত্য আর অহঙ্কার ভাঙবার জন্যেই। আজ তাদের মত দশ-বিশটা সংসারের সম্পদ আমি যে কোন মুহূর্তে কিনতে পারি। দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারী গ্রামের মধ্যে ধনী প্রশান্তবাবুর বিধবা কন্যাকে অর্থ মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিমেষে টেনে এনে তুলেছে কলকাতার বালীগঞ্জে। যদিও তারা নকল স্বামী-স্ত্রী, তথাপি সবাই জানে, পারুল সর্বাধিকারী তার বিয়ে করা বউ। কিন্তু তাদের সম্পর্ক ভেজাল। তবে এও সত্য ভেজালের কারবার করে মুকুল সর্বাধিকারী বড় হয়েছে, তার স্ত্রী ভেজাল হবে, আরও পাঁচটা ভেজাল উপপত্নী থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি বলো ?'

টেবিল থেকে মাথা তুলে সরবে কেঁদে ওঠে পারুল। বলে, 'না—না, আমি বিশ্বাস করি না।—আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই।'

'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না।' —কথাগুলো এমন ভারে মুকুল বলেন, পারুলের সর্বাঙ্গে যেন তাচ্ছিল্যের বিছুতি ছুঁয়ে যায়। জ্বালা করে ওঠে গোটা শরীর।

একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় মুকুল। তারপর জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'গ্রামের হীন দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব প্রথমে তোমার বাবাই করেছিলেন। যেহেতু আমার আর কিছু না থাক, আমি নাকি

রূপবান। মনে আছে বোধহয়, ছোটবেলায় আমাকে অনেকে 'শিমুল ফুল', 'পিতলের কাটারি' বলে ধিক্‌কার দিতো। সে যাই হোক তিনি অবস্থাপন্ন মানুষ, তাঁর বিষয়-সম্পত্তি থেকে আমাদের অর্থাৎ তাঁর মেয়ে-জামাইকে কিছু দেবেন এ-কথাই শুনেছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম, তিনি তাঁর মত বদলেছেন। তোমার বিয়ে হলো সুশীলবাবুর সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বিধাতা বিয়ের তিন বছরের মধ্যে সুশীলবাবুকে ছিনিয়ে নিলেন তোমার কাছ থেকে। অর্থাৎ তোমাকে আসল সংসার থেকে সরিয়ে এনে আমার নকল সংসারে নকল জীবন যাপনে বাধ্য হবার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুকুল আবার বলেন, 'তখন আমি পুরোপুরি সংসারী, যদিও দারিদ্রের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি। ভাবলাম, এভাবে বাঁচা যায় না। যে কোন প্রকারে অর্থ রোজগার করতে হবে আমাকে। পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি নেই তেমন, চাকরি দেবে কে ? কি ভাবে কোথায় অর্থ পাব ?'

কথা বলতে বলতে বাইরের ফ্লাটে এলেন মুকুল। আকাশ তখন শুক্লপক্ষের দশমীর চাঁদ সকরুণ ভাবে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। নিঝুম শহর। মাঝে মাঝে দু-একখানা গাড়ী বোধহয় বিশেষ প্রয়োজনে যাতায়াত করছে।

॥ পাঁচ ॥

পুনরায় ঘরে এসে ঢোকেন মুকুল।

পারুল তখন বিপর্যস্ত ভয়ে।

কি যেন একবার ভেবে নিলেন মুকুল। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'তারপর এলো আমার জীবনে পরম শুভলগ্ন। শোন কিভাবে—'

সেবার মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই নায়েব-গোমস্তা এবং জন কয়েক পেয়াদা নিয়ে গ্রামের কাছারিতে এসেছেন।

শুনলাম গ্রামের অধিকাংশ প্রজার পাঁচ-ছ' সনের খাজনা বাকী। তাই তাঁর সদলবলে আগমন। তিনি যে কোন প্রকারে খাজনা আদায় করবেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত কৃষ্ণকান্তবাবু ছিলেন সে চাকলার যম। প্রজা ঠ্যাঙাবার পদ্ধতি ছিল তাঁর অভিনব। তবে শুনেছি, শুধু হাতে না পেরে ভাতে মারবার কাজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অপূর্ব কৌশলে প্রজার ঘরে আগুন, হালের বলদের জাবনায় গোপনে বিষ প্রয়োগ, পেয়াদা দিয়ে বাড়ীর বউ-ঝিদের অপমান—এসব ছিল তাঁর জব্দ করবার প্রথম শ্রেণীর কৌশল।

পেয়াদা এসে আমায় ডাক দিলে।

জবাব দিলাম, 'যাচ্ছি—'।

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো শ্যামলী।—'তোমার পায়ে পড়ি, যেও না—তুমি যেও না—। শুনেছি, জমিদারবাবু লোক ভাল নয়, কারও সম্মান রাখেন না।'

'তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছো। দরিদ্র বলে অপমানিত হয়ে আসব না, প্রয়োজন হলে অপমান করে আসব!'

'সে অধিকার তোমার নেই, পাঁচ সনের খাজনা বাকী যাদের, তাদের অহঙ্কার করা সাজে না।'

'কিন্তু তাদের দেবার সামর্থ্য থাকলে অকারণ যে অপমানিত হতে চায় না, সে-কথাটাই তাঁকে জানিয়ে দিতে চাই। তুমি বাধা দিও না।'

শ্যামলী ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললে।

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

রোয়াকে একটা আরাম চেয়ারে বসে আছেন কৃষ্ণকান্তবাবু। দু-পাশে জনকয়েক তাঁবেদার। যার মধ্যে প্রধান স্তাবকের ভূমিকায় ছিলেন তোমার বাবা। নায়েব-গোমস্তারা আপনাপন কাজে মগ্ন। উঠানে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন প্রজা করজোড়ে বসে আছে—যেন তারা পূজার উৎসর্গীকৃত বলি। ভয়ে সব কাঁপছে।

আমি পেঁাছোতেই গোমস্তা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে এবং আমার দারিদ্রের কথা জানিয়ে দিয়ে আমার পাঁচ সনের খাজনা বাকীর কথাটা বললেন অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভাবে।

আমি নামক অপদার্থ তখন লজ্জায় মাথা হেঁট করেছি। আমি দরিদ্র, আমি জমিদারের খাজনা শোধ করতে পারিনি অতএব আমি তাঁর কাছে ঘৃণ্য। তাঁর কাছে আমার অক্ষমতা বুঝি অমার্জনীয়—কিন্তু কেন?

গড়গড়ার নলে কয়েকটা ঘন ঘন টান দিয়ে কৃষ্ণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'খাজনার টাকা এনেছো?

'আঁজ্ঞে না—'

'কেন?'

'যোগাড় করতে পারি নি—'

'এ'টা কি একটা কথা—? খাচ্ছো-দাচ্ছো দিব্যি, চেহারাখানাও দেখছি বেশ নাদুসনুদুস, অথচ সামান্য খাজনার টাকাটা যোগাড় করতে পার না? হাল সন পর্যন্ত কত বাকী হে?'

গোমস্তা বললেন, 'চার পাঁচ বিঘা ত জমি মাত্র। সুদ তস্য সুদ নিয়ে আঁজ্ঞে—পঞ্চাশ টাকা বার আনা।'

গম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণবাবু বলেন, 'তিনদিন সময় দিলাম, এর মধ্যে দিতে হবে—বুঝলে ?'

'কিন্তু এ-বছর অজন্মা, তা'ছাড়া এ আষাঢ় মাসে আমার পক্ষে টাকা পয়সা যোগাড় করা বড় কঠিন। বৃদ্ধ মা-বাবা, বিয়ের যোগ্যা দু'টি বোন আমার ঘাড়ে—তাদের খাওয়াতে পরাতেই অমি হিমশিম খাচ্ছি, একটা চাকরি না হলে—'

আমার কথা শেষ না হতেই ব্যঙ্গকণ্ঠে তিনি বলেন, 'হাসালে যে হে, মা-বাবাকে বুড়ো বয়সে দেখবে না, বোনেদের বিয়ে দেবে না—হুঁ, দেখছি এখনও কচি খোকাটি হয়ে থাকতে চাও—বলি, ওহে শুনছো তোমরা—' বলেই কৃষ্ণবাবু পার্শ্বচরদের দিকে চেয়ে সরবে হেসে উঠলেন।

'হো-হো, হি-হি, হাঃ-হাঃ'—বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠলেন পার্শ্বচররা।

তাঁদের হাসি থামতেই আমি বললাম, 'দেখুন, অক্ষমতার গ্লানি আমার মনেও ধাক্কা দেয় কিন্তু নিরুপায় হলে তাকে যতই পীড়ন করা হোক বেদনা ছাড়া কিছু লাভ হয় না।'

'হুঁ, তত্ত্ব কথাও বেশ জানো দেখছি, যাক্‌গে, তিন দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে,—আমার এখন অনেক কাজ।'

'চেষ্টা করবো—' বলে আমি চলে এলাম।

শ্যামলী একটা অঘটন ঘটার আশঙ্কায় ঘর-বার করছিলো অনেক্ষণ ধরে। আমাকে চিন্তিত ভাবে ফিরতে দেখে বলল, 'কি খবর ?'

'তিন দিনের মধ্যে খাজনা শোধ করতে হবে—এই তাঁর আদেশ।'

ছিল একগাছা লিকলিকে হার ভরি খানেকের—সেটা খুলে দিলে সে। 'জমিদারের ঋণ শোধ করো আগে।'

'না—' বলে হারগাছা ফিরিয়ে দিলাম শ্যামলীর হাতে।

'ও, আমার জিনিস বুঝি নিতে নেই! তোমার অপমানের চেয়ে হারগাছাটাই আমার বেশী হলো বুঝি? বেশ!'

মাত্র চার ভরির মত সোনার গহনা ছিল শ্যামলীর। হারগাছা ছাড়া আর সবই আগে শেষ হয়েছে। সেটা আর নিতে মন সরলো না। বললাম বুঝিয়ে তাকে, 'ছুদিন চেষ্টা করে দেখি, যদি যোগাড় না হয় তখন না হয় এটা বিক্রি করা যাবে।'

'দেখো যেন লজ্জা করো না' বলে নিজের কাজে চলে যায় শ্যামলী।

অন্তরে এক অনির্বচনীয় অনাবিল আনন্দ পেলাম সে-সময়। ভগবান আমাকে দরিদ্র করে সংসারে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেদিন সে-মুহূর্তে যে স্বর্গীয় আনন্দ পেলাম তার তুলনা হয় না। চলচ্চিত্রে সাজানো দৃশ্য দেখে এবং বানানো সংলাপ শুনে যদি আমরা তা' সংসারে প্রত্যাশা করি—ভুল হবে। কিন্তু আমি বোধহয় তার চেয়েও বেশী পেয়েছি। সত্যকার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি তার। কিন্তু তাকে কিছুই দিতে পারিনি। হায় হতভাগিনী শ্যামলী! উঃ!

তিনদিন পর ফের আমার ডাক পড়ল জমিদারের কাছারিতে। গেলাম রিক্ত হস্তে। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে। অবশ্য ঠিক করেছিলাম আগের থেকে—যদি আজ কোন কটু মন্তব্য শুনতে হয়, যথোচিত উত্তর দেবো। কিন্তু কেন জানি না, কৃষ্ণবাবু যাওয়া মাত্র বললেন, 'সেদিন তুমি চাকরির কথা বলছিলে না? আমার একজন ভ্রাম্যমাণ রাঁধুনীর প্রয়োজন। এই ধর না আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাবে, খাওয়া পরা বাদে মাসে পনের-ষোল টাকা মাইনে পাবে, পারবে তুমি? শুনেছি, লোকের ভোজ কাজে ভাল রান্না করো—এ চাকলায় বেশ সুখ্যাতিও আছে তাতে তোমার।'

বেকার বাড়ীতে বসে আছি তখন আমি। বললাম, 'খুব পারব, তবে মাইনেটা কুড়ি টাকা করে দিতে হবে।'

'আটকাবে না তাতে—'

আমার খাজনা বাকীর কোন কথা উঠল না। পরদিন থেকেই চাকরিতে বহাল হলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ছুঁচ হয়ে ঢুকবো আর ফাল হয়ে বেরবো। এই সুযোগ, ধনী হতে হলে এরকম পরগাছা চাই।

চাকরিতে বহাল হবার কিছুদিন পর শ্যামলী আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমার মনে রেখে গেল একটা কালোছায়া। অতৃপ্তিকর হৃদয়াবেগ। শোক সন্তপ্ত আমি নিজেকে শক্ত করলাম। যে যায় আর ফিরে আসে না। আমার টাকা চাই। টাকা ছাড়া এ-যুগে এক পা ফেলা বিপজ্জনক। সংসার চালানো ত বটেই। এখন সব ভুলে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। দরিদ্রের শোক প্রকাশের ত সময় নেই।

আমার দিদির বহুদিন আগেই বিয়ে হয়েছিলো। বোনেদের চেহারা ভাল ছিলো, এক দয়ালু ভদ্রলোক তাদের দেখেই বিনা পণে তাঁর দুই ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হলেন। আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

॥ ছয় ॥

বছর তিনেক পর।

আমি তখন কৃষ্ণবাবুর কাছে রীতিমত স্নেহের পাত্র হয়ে পড়েছি। আমার রান্না ছাড়া তাঁর খেয়ে তৃপ্তি হয় না। কি ঘরে, কি বাইরে।

সেদিন লাটের টাকা দাখিলের শেষ দিন। কৃষ্ণবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা সদরে গেলেন।

হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ডাকলাম। তিনি তাঁকে পুরোপুরি বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন সেদিনটা। প্রেসার বেড়েছে।

কৃষ্ণবাবু কাছে ডাকলেন আমাকে। 'টাকাটা তুমিই জমা দিয়ে এসো। ট্রেজারীতে মোক্তারবাবুর কাছে গেলে তিনি সব ঠিক করে দেবেন। শুনলে ত ডাক্তারের কথা? কি চুপ করে রইলে যে—পারবে না?'

আমি বললাম, 'পারব'।

কৃষ্ণবাবু আমার হাতে দশ হাজার টাকার থলিটা দিয়ে বললেন, 'খুব সাবধান'!

সে বাজারে দশ হাজার টাকার মূল্য অনেক। এখনকার একলাখ টাকার মত।

আমার গোটা শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হল, বুকের স্পন্দনও গেল বেড়ে। দারিদ্র কবলিত তীক্ষ্ণ লালায়িত চোখ দুটো হয়ে উঠলো উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরপুর।—দশ হাজার টাকা! আমার কাছে তার মূল্য অনেক—অনেক। সারা জীবনেও হয়ত এত টাকা রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সংসারে দরিদ্র হয়ে জন্মেছি। তবে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই যদি ধনী হয়, ধনাঢ্যের মহিমা থাকবে কি!

মানুষের মনুষ্যত্ব যে কোথায় গুঁড়িয়ে মিশিয়ে যাবে ধরণীর বুকে তারও কুল-কিনারা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এভাবে কি বাঁচা যায়? সংসারের দারিদ্রের এক ভয়ঙ্কর রূপ সদাসর্বদা আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। আমি তাড়িত পশুর ন্যায় যেন পৃথিবীর বুকে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে মরছি। স্ত্রী দারিদ্র বরণ করে নিয়েছিলো বটে, কিন্তু আমি যে তার মৃত্যুকালে সুচিকিৎসা করাতে পারিনি। সে কি আমার কম দুঃখের? বছর খানেক আগে মা-বাবা ছ-মাস আড়াআড়ি মারা গেছেন, তাঁদের উপযুক্ত মত সেবা-যত্ন করতে পারিনি—সে কি আমার মন-বিদীর্ণ দুঃখের নয়?

তবে কি আমার দস্যু রত্নাকরের মত হওয়া উচিত ছিল? এ-যুগে ত রত্নাকর ভিন্ন ধনী হওয়া যায় না। পরস্ব অপহরণ—সে যেভাবেই হোক—এ ভিন্ন জগতে সৎ ভাবে ধনী হওয়া কজনের পক্ষেই-বা সম্ভব? আজ যে ধনী তার অতীতের কথা জানলেই বুঝতে পারা যাবে, তার ভিত একদিন নড়বড়ে ছিল কিনা, তার মূলধনের টাকা কিভাবে পেয়েছিলো তার পূর্বপুরুষ?

দশ হাজার টাকা!

আমার জীবন্মৃত মন মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠলো। ভবিষ্যৎ অন্তরে রুদ্ধ থাক। আপাত সুখই কাম্য। দারিদ্র থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। পাপপুণ্যের হিসাব করা আমার নয়, যিনি অলক্ষ্যে তা' করেন, তিনিই করুন। তা'ছাড়া বর্তমান নিয়ে যারা সর্বদা হিমশিম খাচ্ছে তাদের এত জমা-খরচের হিসেব কেন পাপপুণ্য নিয়ে? যুক্তিতর্ক মানবার প্রয়োজন কি?

কাতরাতে কাতরাতে কৃষ্ণবাবু বললেন, 'টাকাগুলো আর একবার গুনে নাও ভাল করে।'

আমি ভাগ্যবান। থলির মুখটা খুললাম।

অধিকাংশ একশো টাকা—কিছু দশ টাকার নোট। আমার জীবনে কোনদিন একশো টাকার নোট হাতে পাইনি। রাজমুকুটের

ছাপ শোভিত একশো টাকার নোট ছোঁয়া আর আকাশ ছোঁয়া একই বলে মনে হলো তখন আমার। ভাগ্যবান রাজা। আর একশো টাকার নোটগুলো যারা কাগজের মত বাণ্ডিল বেঁধে সিন্দুকে রাখে তারাও সৌভাগ্যবান। অর্থ মহিমাতে তারা গোটা তুনিয়া মুঠোর মধ্যে রাখতে পারে। দেহের বল থাক আর নাই-থাক, এই টাকার খেলা চলেছে তুনিয়া জুড়ে আর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ!

নব্বইখানা একশো টাকার নোট আর বাকী সবই দশ টাকার নোট। গুনতে আমার আধঘণ্টা সময় লাগলো। প্রতিটি একশো টাকার নোট গুনি আর কপালে ছোঁয়াই কৃষ্ণবাবুর অলক্ষ্যে।

সব টাকা গুছিয়ে থলিতে পুরে ফেললাম। থলিটা বুকে ছোঁয়ালাম।—দশ হাজার টাকা!

কৃষ্ণবাবু এবার বলেন, 'যাও, দেরি করো না, তিনটে বাজে। হ্যাঁ আর এক কথা, পঁচিশটা টাকা বেশী নিয়ে যাও—প্রয়োজন হতে পারে।'

'তুর্গা তুর্গা'—বলে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝিবা চিরবিদায় এখন থেকে।

অলক্ষ্যে লোভ নামক রিপুটা তখন আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে। আমার মত মক্কেল পেয়ে সে যেন ভীষণ খুশী। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ইঙ্গিত-আভাসে আমাকে এখান থেকে সরে যাবার তীব্র ব্যাকুল অনুরোধ। অন্তরের কল্পিত প্রাসাদ, অজস্র অর্থ যেন আমার সামনে তখন সুস্পষ্ট।—ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল আমার অতীত। আমি বর্তমানের—আমি ভবিষ্যতের!

কিন্তু সব কিছুর ওপর রয়েছে মানুষ। মানুষের জীবনে একদিকে আছে তুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, আর অন্য দিকে অবশ্যই আছে প্রীতি-

প্রেম-সত্যনিষ্ঠার মহান আদর্শ। তবু দারিদ্র, আদর্শের দেবতার করুণ মুখচ্ছবিকে কিছুতেই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না সব সময়। তখনও আমার মন মলিন হয়নি, আমি হলফ করে বলতে পারি, এত দুঃখকষ্টেও অন্তর দীপ আমার তখনও মহান সত্যের জ্যোতিতে অনির্বাণ। দুঃখ কেবল, দারিদ্রের আগুন নেভাতে পারিনি আমি। মন সদা বুভুক্ষু। আমি কি শুধু বিশ টাকা মাইনের চাকরিতেই জীবনভোর তৃপ্ত থাকব? নামগোত্র-হীন মুকুল সর্বাধিকারী কি অপরিচয়ের ধূম্রজাল ছিন্ন করে মনোমত সংসারের সন্ধানে যাত্রারম্ভ করতে পারে না আর? বুক ফুলিয়ে যারা তাকে এতদিন ঘৃণা করেছে তারা কি তার এ অপকর্মের কথা মনে রাখবে তখন?—কেউ রাখে না, বরং ধনী-মানীদের অতীতের ইতিহাস ছাই চাপা দিয়ে তাকে কৌলীন্যের আঙিনায় এনে স্তবস্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠে। আড়ালে ঘৃণা করলেও সামনে রাখে নকল সম্মানের উপঢৌকন। দম্ভের কৃত্রিম জগতে মিথ্যার কঠিন আবরণ উন্মোচন হয় একদিন বটে, কিন্তু সেজন্য কেউ মাথা ঘামায় না তেমন। আর যারা ঘামায় তাদের ঘা' খেতে খেতে জীবন যায়। দারিদ্র পঙ্গু সমাজকে এক ধাপ আগিয়ে দেয় মাত্র।—যার ধাপ হাজার হাজার। লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দেরি।

ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলাম আমি। কি করি? মাথাটা গুলিয়ে উঠছে বার বার। তবু যেন স্বপ্নময় কল্পনার ছবিগুলি চোখের ওপর পিপাসাময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সর্বগ্রাসী আগুনের দিকে ধাবমান হলাম আমি।—যা চেয়েছিলাম!

দশ হাজার টাকা!

ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোভের আগুনে। দিশেহারা হয়ে পড়লাম রঙীন স্বপ্নময় কল্পনায়। যেন মেঘের আড়ালে আমি চাঁদ হয়ে হাসছি। দেখছি পৃথিবীটাকে কত ক্ষুদ্র। আমি বুঝি পৃথিবীর

একজন হয়েও কতদূরে—সত্যের জগৎ থেকে আমি একটি বিচ্যুত আম্রমুকুল ছাড়া কিছু নই! আশ্চর্য!

রইলেন পিছনে পড়ে আমার মনিব। আমি যে একদিন তাঁর ভৃত্য ছিলাম, ভাবতেই পারছি না। বাঁকা কটাক্ষে অন্তরকে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখিয়ে লোভের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে আমি যথাস্থানে টাকা জমা না দিয়ে সোজা চলে এলাম কলকাতায়।

॥ সাত ॥

অধর্মের নামাবলী গায়ে চড়ালাম।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা গলিতে ঘুপচি মত খোলার ঘর ভাড়া নিলাম দশ টাকা ভাড়াতে।

একটা বাক্সে টাকার থলিটা বন্ধ করে রাখলাম। তা থেকে নিলাম মাত্র পাঁচশো টাকা। ফিরিওয়ালা সাজবো আপাততঃ। নাম বদলালাম। আমি মুকুল সর্বাধিকারী হলাম দীনবন্ধু রায়।

ফিরিওয়ালার সাজ, কথাবার্তা, হাঁকডাক রপ্ত করে নিলাম কিছুদিনের মধ্যে। পাড়ার বাসিন্দাদের মনে কোন সন্দেহই রাখতে দিলাম না। কলকাতায় আর কে কার খবর রাখে?—বিশেষ করে আমার মত একজন ফিরিওয়ালার!

টাকায় টাকা টানে বুঝলাম। বছর খানেক কাপড়-জামা ফিরি করে পাঁচশো টাকা খরচ খরচা বাদে এক হাজারে দাঁড়াল। মনে আশার আলো সঞ্চিত হয়ে আমার উচ্চাশাকে যেন তুলে ধরলে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে।

এসব করলেও আমি খবর রাখি, আমার কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণবাবু কি করছেন। চিন্তা করি কিভাবে পুলিসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে হবে!

হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের এককোণে দেখলাম, শোক সংবাদ —"মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই অনন্তধামে গমন করেছেন সত্তর বছর বয়সে।"

পুলিস কিন্তু আমাকে আমার পালিয়ে আসার দিন থেকে গোটা ভারত জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্রেও বার বার সেকথা লোকচক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

বছর দেড়েক পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।

ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধের ব্যাপারে এরোড্রাম স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখলাম—কণ্ট্রাক্টর চাই !

আমি শ্রীদীনবন্ধু রায় সাহসে ভর করে আবেদন করলাম যথাস্থানে। পেলাম একটা কাজের কণ্ট্রাক্ট। লাভ হলো প্রচুর। বাসা বদলালাম উত্তর কলকাতায়।

শুধু এরোড্রাম তৈরী নয়, সে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহেরও একটা কণ্ট্রাক্ট পেলাম।...তিন বছর পর দশ হাজার এক লক্ষতে পৌঁছুলো। তখন আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী ও দু'জন ম্যানেজার কাজকর্ম দেখাশোনা করছে। আমি তাদের মনিব। তারা আমার কথায় ওঠ'বস করে। তারা আমার চেয়ে শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ভিন্ন কোন বিশেষ কাজে হাত দিতে পারে না। আজ আর আমি একশো টাকার নোট কপালে ছোঁয়াই না। দশ হাজার টাকা গুনতে আধঘণ্টা সময়ও লাগে না। হাঁটুর তলায় নোটগুলো ফেলে বড় জোর চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগে।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেল। কিন্তু আমার অর্থ লালসার উন্মত্ত আবেগ থামল না। অহরহ অর্থ উপার্জনের জন্য যুদ্ধ চলতে লাগল—ফাঁক আর ফাঁকির সঙ্গে। শুধু ধর্মে ব্যবসা হয় না, অধর্মের মিশাল চাই। টাকার নেশায় মেতে উঠছি তখন আমি। বড়বাজারে বড় বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছি। প্রথম প্রথম তোষামোদ, খোসামোদ—তারপর মিতালির পরাকাষ্ঠায় তাদের কাছে যে অমূল্য উপদেশ পেয়েছি জীবনে তা' ভুলব না। বুঝলাম ব্যবসা করে শুধু অর্থোপার্জন নয়, মানুষের পরমায়ু তিলে তিলে কমাবার জন্য এদের অবদান চিরঃস্মরণীয়।—আমি তাদের সমগোত্রীয় হয়ে গেলাম। আমাকে আঁধার থেকে আলোয় নিয়ে এলেন তাঁরা। আমি ব্যবসা শুরু করলাম। -আমার ট্রেনিং প্রয়োগ শুরু করলাম বিভিন্ন নিরীহ দ্রব্যসম্ভারের ওপর। সেসব নিত্যনতুন প্রসাধনের প্রলেপে নির্ভেজাল ষ্ট্যাম্প মারা মোড়কে টিনের বাক্সে বন্দী হয়ে

দেশে দেশে বেলুনের মত ছুটতে শুরু করলো। সেসবের চাহিদা বাড়তে লাগলো দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত। নকলের জয় হোক!

আমার ব্যবসায়ী গুরুদের তখন দু-চোখ ছানাবড়া! স্বীকার করেন প্রকাশ্যে তাঁরা—হ্যাঁ, ছোকরা ব্যবসা কাকে বলে জানে! তবে মনে রেখো ছোকরা, সর্বদা মনে রাখবে, সাহস চাই। বুক ফুলিয়ে যা' খুশী করবে, কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না, প্রয়োজন বোধে দু-পাঁচ হাজার রোপেয়া ছুঁড়ে দেবে। যারা ধরবার জন্যে জাল পেতেছিল, তারাই 'স্যালুট' করে সরে যাবে হাজার গজ দূরে।

আমি তখন সম্পূর্ণ ভেজাল। রাতদিন ভেজাল চিন্তা করি। ভেজালের কারবারে আরও হাত পাকাবার ভ্রষ্টামিতে মশগুল।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার ভূতপূর্ব মনিব আমার নামে দশ হাজার টাকা সহ পলায়নের যে কেস করেছিলেন, তা ডিসমিস হয়ে গেছে। পুলিস গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য জনসাধারণের কাছে আমার বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির বিবরণ ও কৃষ্ণবাবুর দরবারে আমার চাকরির পদবী শুনে সদরে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যে একজন রাঁধুনীর হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে লাটের টাকা দাখিল করার ঘটনা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু তাঁর দু'জন নায়েব, পাঁচজন গোমস্তা, সদরে দু'জন বাঁধা মোক্তার, একজন উকিল থাকতে একটা অশিক্ষিত রাঁধুনী বামুন গেল, লাটের টাকা জমা দিতে! এ ঘটনা বিশ্বাস করা পুলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যে-কোন কারণে টাকা দাখিল করতে অসমর্থ ছিলেন, এই তাদের ধারণা। গ্রাম্য জনসাধারণেরা জবানবন্দী দিল, মুকুল সর্বাধিকারী সংসারের সবইকে হারিয়ে শোকে দুঃখে পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা গর্বিত জমিদারের কাছে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়ত অন্ধকূপে বন্দী হতে বাধ্য হয়েছে—এ তাদের অনুমান।

পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আদালত আর 'কেস'টা

বেশীদিন জিইয়ে রাখবার সার্থকতা খুঁজে পেলেন না। কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

বুঝলাম, সৌভাগ্য দেবীর অপার করুণা নীরবে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর। আমি নবীন বলে বলীয়ান হলাম। আমার অন্তরতম প্রদেশে যে একটা গুপ্ত কাঁটা ছিল, সেটা আপনাআপনি উপড়ে গেল ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টির ফলে।

আমি আমার আসল নাম ফিরিয়ে নিলাম।

আমার দেহ মনও কলুষিত হয়েছে তখন অতিমাত্রায়। ঘর বাঁধার চেয়ে সে স্বপ্নময়, মোহময় কুহকিনীদের ডাক, তাদের প্রসাধন-লাঞ্ছিত দেহ-মনগুলো অধিকার করে রয়েছে আমার দেহের প্রতিটি রোমকূপগুলো পর্যন্ত !

॥ আট ॥

তারপর সেদিন বালীগঞ্জে দশ কাঠা জায়গা কিনে রেজিস্টারি করে নিয়ে জোর স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছি। 'আনন্দ উদ্বেল হৃদয় মেতে উঠেছে কত তাড়াতাড়ি গৃহনির্মাণ করতে পারি তার পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকারের জয়ের চেয়েও আমার আজকের এ জায়গা কেনার যুদ্ধ জয়ের যেন তুলনা নেই। বহু কসরত করে জায়গাটা আমার কবলিত হয়েছে। দালালী, উপদালালীতেই গেছে দশ হাজার টাকা।

আমি ব্যবসায়ী মহলে এতদিনে কুলীন হলাম। সম্পূর্ণ নিকষ কুলীন, যেহেতু টাকা-গাড়ী-বাড়ীর অভাব রইল না আর আমার।

মনের স্ফূর্তিতে গাড়ী নিয়ে চলে এলাম লেকের ধারে। বসলাম গিয়ে একটা বেঞ্চে।

কেন জানি না, ভাবতে ভাল লাগল আমার অতীত। বসে বসে সিগারেট টানছি আর ভাবছি। আজ জায়গা কিনলাম এবার ঘর আরম্ভ হবে। কিন্তু তারপর ? কার জন্যে ঘর বাঁধবো ? ঘর বেঁধেই-বা কি লাভ ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি ছাড়া কে-ই বা আছে আমার ? দু-চোখ ফেটে জল এলো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

ভুলে গেছিলাম আমি কাঁদতে। দীর্ঘ একযুগ ধরে আমি বেপরোয়া হয়ে আছি। আমার আমি ছাড়া সুখ-দুঃখ নেই। ভেজাল ছাড়া আসল নেই। নকলের জয়গান গেয়ে আসছি এতদিন। নকলের জয়মাল্য পেয়েছি ভাগ্যদেবীর কৃপায়। সব আছে আমার, নেই শুধু ঘরকে ঘর বলে স্বীকার করবার মত একজন ; যাকে ছাড়া ঘর বাঁধা যায় না।

শ্যামলীকে মনে পড়ে গেল। এতদিন পর তার কথা স্মরণ করে মনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেন সেদিনের সে দারিদ্র-অভিশপ্ত দিনগুলো আমাকে আজকের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য করলে।

পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, 'মুকুলদা—মুকুলদা—'

'তুমি পারুল, না?'

'হুঁ—'

'এখানে কোথায়?'

'দাদার বাসায় এসেছি।'

'কতদিন হলো?'

'প্রায় এক বছর—'

'হুঁ, শুনেছি, তোমার দূরদৃষ্টের কথা—'

'সেকথা থাক মুকুলদা, তোমার কথা বলো! আমরা ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত বেঁচে নেই!'

'তবু বেঁচে আছি, এবং সসম্মানে—'

'তার মানে?'

'সে অনেক কথা পারুল, পরে বলবো।'

'খুব ব্যস্ত বুঝি, এখন?'

'না, তেমন কিছু নয়, তবে—'

'থাক্, বাধা থাকলে বলতে হবে না, আর—'

'বাধার কথা নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কি মুকুলদা?'

আমি চোখ মুছতে ভুলে গেছিলাম। দু-চোখে অশ্রুধারার চিহ্ন দেখে পারুল বলে, 'একি! তোমার দু-চোখ লাল, দু-গালে —অশ্রুধারা!'

পারুলের কথা শেষ না হতেই বললাম, 'ও কিছু না—' বলে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছলাম।

'মুকুলদা, বুঝতে পারছি, তুমি এখানে বসে কাঁদছিলে সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু এখানে ত লোকে আনন্দ পেতে আসে, তুমি কাঁদছিলে কেন বলবে ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'বলবো পারুল, বলবো। আমার কথা জানবার মত কেউ নেই ত্রিসংসারে। তোমাকেই বলবো, বলে তৃপ্তি পাব বোধহয়।'

'সেকথা বলতে পারি না, তবে বলতে হবে। এবং এক্ষুণি !'

'উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। বসে পড়লাম দু'জনে একটা বেঞ্চে।'

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থাকলাম। সত্য বলবো না মিথ্যে বলবো এবং কিভাবে কথাটা আরম্ভ করি, ভাবতে লাগলাম।

পারুল অধীর হয়ে উঠেছে তখন। বললে—'বেশী দেরিহলে দাদা-বৌদি ভাববেন, আমি বরং উঠি আজ !'

কাপড়ের আঁচলটা ধরে টান দিলাম। 'দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তবে পারুল, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আমি তোমাকে যা' বলবো কোনদিন কাউকে প্রকাশ করবে না বলো ?'

'দিলাম, এই তোমার গা-ছুঁয়ে বলছি মুকুলদা। ভগবান আমার সর্বনাশ করেছেন, আর পরকালের মাথা খেতে চাইনে !'

'পরকাল মান তুমি ?'

'তুমি বুঝি মান না ?'

'মানি, কিন্তু, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

'কিন্তু একদিন ঘামাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেদিন অতীতের কথা স্মরণ করে হয়তো বুঝবে, আসল সত্য অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয় এবং সে আসল সত্য সন্ধানের জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তখন মাথা খুঁড়েও অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

অনুশোচনার ধিক্‌কারে মনপ্রাণ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে, গীতায় ভগবান বলেছেন—'

'বুঝেছি, তুমি গীতা পড়—'

'হ্যাঁ, গীতাই এখন আমার জীবনের সাথী !'

'কিন্তু গীতার শ্লোক নিয়ে মেতে থাকার মত বয়েস তোমার নয়। বাধ্য হয়ে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেও অন্তর কি ঠিক সায় দিচ্ছে তাতে তোমার ? আমি জানি কামনা-বাসনার বস্তু অকালে হারিয়ে তুমি এ-সবের চর্চায় কাল কাটাচ্ছো মাত্র, কিন্তু মনপ্রাণ দিতে পারনি।—পারলে কলকাতায় দাদার বাসায় এসে মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা হতেই তার বিষয় জানবার কৌতূহল থাকত না !'

'মুকুলদা, তুমি আগের ব্যাপার নিয়ে খোঁটা দিচ্ছো মাত্র। আর এক কথা, ধর্মগ্রন্থ পড়লেই মানুষ দেবতা হয়ে যায় না। আমাকে মাপ করো মুকুলদা, আমি যাই।'

'আজীবন তোমরা দরিদ্রকে হীন নীচ ভেবে আসছো, দেখছি আজও সে দেমাক যায়নি তোমাদের।'

'তুমি কি ঝগড়া করতে চাও আমার সঙ্গে ?'

'না, আমার কথা শোনাতে চাই !'

'যদি না শুনি ?'

'তোমার কৌতূহলের জন্যেই শোনাতে চেয়েছিলাম, তবে শোনাবার আগ্রহ তেমন নেই। অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শুনবে। আজ রাগ করে উঠে গেলেও পরে শোনবার আগ্রহে ছুটে আসবে। হয়ত সেদিন আমার সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে।'

সুন্দর হাসিতে মুখখানা ভরে ওঠে পারুলের। 'তোমাকে ত জানি, বাপরে বাপ, কথাতে পারবার যো নেই তোমার সঙ্গে। জাদুমাখা কথা কেবল !'

'শুধু কথাতে জাদু নয়, দেহ-মনেও জাদু আছে। তুমি সব কথা শুনলে বুঝবে আমি একজন আশ্চর্য জাদুকর!'

'বেশ বাপু বলো—' বলে মুকুলের কাছ ঘেঁষে বসে পারুল।

'সব কথা সত্য বলবো?'

'ইচ্ছে হলে, বলতে পার!'

'নির্ভয়ে?'

আবার হেসে ওঠে পারুল। 'অভয় দিলাম—'

'শোন তবে—'

কোন কথা গোপন না করে আদ্যপ্রান্ত খুলে বললাম তোমাকে। আমার সব কথা শোনার পর তুমি বিস্মিত হয়ে গেলে, 'সত্যই তুমি জাদুকর মুকুলদা—তোমার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন সফল হয়েছে শুনে খুব খুশী হলাম। জানো মুকুলদা, জোর জবরদস্তিতে আপনার কামনার বস্তু ছিনিয়ে নিতে হয়, বসে বসে তপস্যা করলে পাওয়া খুব দুষ্কর।—সে তোমার অন্তরের যে কোন কাম্যবস্তুই হোক'!

'তুমি সমর্থন করছো, তা'হলে? ভেবেছিলাম, গীতামৃত পান করে ঘৃণা ছাড়া কিছু পাব না তোমার কাছে।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে মুকুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো পারুল দু-চোখ তখন তার জলে ভরা।

বললাম, 'তুমিও ত লেকে এসেছিলে আনন্দ পাবার জন্যে, কাঁদছো কেন?'

'হাঁসা-কাঁদার স্থান-সময় নেই মুকুলদা' কাঁদছি কেন জান, কেন সেদিন—না-না থাক্ সে আমার অন্তরের কথা, এখন স্বীকার করছি, সারাজীবন আমার মরুভূমির তুল্য। যা আমার দূরদৃষ্ট, উঠি কেমন?' বলেই উঠে দাঁড়ায় পারুল।

আমি বললাম, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না ?'

'না, একাই যেতে পারব। তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করি, ঘর হলেই ঘর বেঁধো, কেমন ? তা' না হলে শান্তি পাবে না, পরিপূর্ণ সুখ নেই তাতে।'

'বুঝেছি তোমার অন্তরের কথা। তোমার অন্তরের বেদনা আমার মনেও গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা, ভেজাল মুকুল সর্বাধিকারী ভেজাল বউ নিয়ে ঘর করতে দুঃখিত নয়, যদি তুমি রাজী থাক—'

'মুকুলদা—আমার কামনা-বাসনা আজও আমার সুপ্ত মনে অটুট রয়েছে। তোমার গাড়ী-বাড়ী-টাকার কথা শুনে আমিও যে তখন থেকে মোহজালের আবর্তে স্বপ্নময় কল্পনায় না ভাসছি, তা, নয়। আজ তোমাকে আমার প্রাণের কথা খুলে বললাম—গীতা আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, যেহেতু যার প্রাণের গীত নিঃস্তব্ধ, সে নিস্তেজ বীণাতে গীতার বাণী প্রবেশ করে না। করলেও তা' মর্মস্পর্শী নয়—'

'এত ঠুনকো তোমরা, প্রথমটা ত আমাকে পাত্তাই দিচ্ছিলে না। ভাবছিলাম, প্রস্তাব করলেই প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে সুশীলবাবুর বিধবা পত্নী প্রায়শ্চিত্তের জন্য বাড়ী গিয়ে পুরোহিত ডাকবে।—ভাবতেই পারিনি, এত সহজে তুমি ধরা দেবে। আজ প্রত্যক্ষ হলো, তোমরা যত কঠিন তত সহজ।'

'বিশ্বাস কর মুকুলদা, তোমাকে আমি প্রথম জীবনে মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম। ভালবেসে ছিলাম তোমার সুন্দর স্বাস্থ্যটাকে। কি চমৎকার চেহারা! আজ আন্দাজ চল্লিশ বছর বয়সেও তুমি যেন পূর্ণ যুবক। যাকে পেয়েছিলাম তাকে দুর্ভাগ্য বশতঃ হারিয়েছি অকালে, একি আমার কম দুঃখ ? বাবা-মা মারা গেলেন, দাদা-বৌদি গ্রাহ্য করেন না—আমি তাঁদের ভার বোঝা। তুমি বুঝবে না মুকুলদা-এ অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা বুঝবে না। শুধু স্বামীশোক ভুলবার জন্যেই গীতা পড়ি না—গীতা পড়ি, সর্বদা দাদা বৌদির

খিচখিচ ভুলবার জন্যেও। মনটা কিন্তু পড়ে থাকে অন্যদিকে। কিন্তু নিরুপায় আমি, হাত-পা শিকলিতে বাঁধা!'

কিন্তু ছিঁড়তে হবে সে বাঁধন। উড়তে হবে মনের আনন্দে। অতীত রসাতলে দিতে হবে। যাবে আমার নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীতে?'

'তুমি কি তা' চাও?'

'লোভ আমার আজও যায়নি—'

'কিন্তু একটা শর্ত—'

'বলো—'

'আমি কোন সন্তান চাই না—'

'কিন্তু বাস করবো আমরা প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর মত। রাজী আছো?'

'বলো কোনদিন ঘৃণা করবে না!'

'রূপবান বলে যাকে মনে কর, সে কখনও রূপবতীকে ঘৃণা করে না। চলো আর দেরি করে লাভ নেই!'

'সেই ভাল গো আমার, চলো ঘর হারিয়ে আবার ঘর বাঁধি গে—'

'আর সেই ঘরের লক্ষ্মী হবে পারুল সর্বাধিকারী—প্রসিদ্ধ নকল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর গৃহলক্ষ্মী।'

সদ্য কেনা এ্যাম্বেসডার গাড়ীতে চেপে তারা দুজনে এসে ওঠে নবীন কুণ্ডু লেনের বাড়ীতে।

॥ নয় ॥

ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজে।

পারুলের দু-চোখ ছাপিয়ে তখন জল ঝরছে শ্রাবণ ধারার মত। মুকুলের কথায় কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করে না সে। সব সত্য। তবু সেদিনের সে প্রতিশ্রুতির কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেদিনের মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে আজকের মুকুল সর্বাধিকারীর বহু প্রভেদ। আগেকার সে প্রেমশীতল স্পর্শের মর্মন্তুদ পরিণতি এই প্রথম। বুঝতে পারেনি সে তাকে ঘুমুবার আবেদন জানাতে এসে, এভাবে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা তথা অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কঠোর আঘাত দেবে। কতদিন কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার সময় তাকে ডাকতেই সবিনয়ে বলেছে, 'প্লীজ—এক মিনিট—' তারপর হাসতে হাসতে উঠে এসে বলেছে কৌতুক কণ্ঠে, 'আমি সব উপেক্ষা করতে পারি, ব্যবসায়ে দু-পাঁচ হাজার লোকসানও সহ্য করতে পারি —পারি না কেবল তোমার ডাক উপেক্ষা করতে।'

'কেন বলো ত?'

'জ্বলন্ত আগুনে যে বাধ্য হয়ে আত্মহুতি দিয়েছিলো তাকে উদ্ধার করে এনে আর জ্বালাতে চাই না পারুল। সে শান্তিতে থাক, সুখে থাক এই চাই।'

'কারবার তোমার নকল নিয়ে বটে কিন্তু ভালবাসা তোমার নিখাদ। কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলেও এক কুঁচো খাদ পাওয়া যাবে না!'

'জানো পারুল, ভগবান মানুষকে নিখাদ করেই পাঠান কিন্তু আমরা মানুষরা দেহ-মনে খাদ মেশাই ইচ্ছামত। মেশাতে মেশাতে অনেকের এমন চেহারা হয় যে আসল মানুষকে আর চেনাই যায় না, যেমন আমি। তুমিই একদিন বলেছিলে, গীতায় ভগবান বলেছেন—'

'থাক আর গীতার শ্লোক আওড়াতে হবে না।'

অনেকদিন পর।

বালীগঞ্জের বাড়ীটা তৈরী হয়েছে। রামগোপালের বিয়ের পর তারা নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছে। বাড়ীখানা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল পারুলের। মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাইয়ের বাড়ীতে ছোটবেলায় একবার ভোজ খেতে গিয়েছিলো সে। বাড়ীখানা দেখে খুব ভাল লেগেছিলো তার। অনেকে বলেছিলো তেমন বাড়ী নাকি সে তল্লাটে নেই।—সে-বাড়ী আর এ-বাড়ীর কত তফাত। মহেশগঞ্জের জমিদারের অট্টালিকাকেও হার মানাতে পেরেছে তার স্বামী। এ কি কম গর্বের কথা। সে পুরানো আমলের অট্টালিকার সঙ্গে এ নতুন ছকের নানাবিধ কারুকার্যের কোন তুলনা হয় না। কত সময়, কত অর্থ যে ব্যয় হয়েছে, তার হিসেব নেই। বলেও ফেলেছিলো সেদিন উৎফুল্ল চিত্তে, 'কৃষ্ণবাবুর অট্টালিকাটাকেও হার মানিয়েছো তুমি।'

মুচকে হেসেছিলো মুকুল। 'তাই নাকি?'

বেশ মনে আছে, নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীতে বছর খানেক একত্রে বসবাসের পর একদিন মুকুল বলেছিলো সক্ষেদে, 'কিন্তু কোথায় যেন একটা মস্তবড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে, অবশ্য তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি— ভেবে দেখলাম তা' লঙ্ঘন করা যায় না। তবু যেন—'

'তবু কি, থামলে কেন, বলো?'

'সংসার পাতলাম, ঘরও তৈরী হবে ধীরে ধীরে, তবু যেন কোথায়—'

'আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

'বুঝা উচিত কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে যাচ্ছে।'

পারুল নীরবে মুকুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুকুল বলে, 'আজ আমি সব পেয়েছি। কিন্তু যা ভিন্ন মনে শান্তি পাচ্ছি না তা' তুমি না চাইলেও আমি চাই। আমার পরে কে এসব ভোগ করবে ?'

'ভুল করেছো গো তুমি আমায় ঘরে এনে। বরং বিদেয় করে দাও সময় থাকতে—'

'না পারুল, ভুল আমি করিনি। আর যদি ভুল করেও থাকি ভুল সংশোধন করতে বেশী সময় লাগবে না।'

'তুমি কি আবার একটা বিয়ে করতে চাও

'না' একটা সন্তান চাই।

'কিন্তু—'

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আসল মুকুল সর্বাধিকারী, দীনবন্ধু রায় হয়ে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলাম, নামটা প্রকাশ করেছি কিছুদিন আগে কিন্তু নকল মনটা বিসর্জন দিতে পারিনি। আমি নকল সন্তান চাই, তাতে আমার এতটুকু বাধবে না। তোমার কি তা'তে কোন আপত্তি আছে ?

'শুধু নিজের দিকটা দেখলে ত সংসারে বাস করা যায় না। আমার তাতে একবিন্দু আপত্তি নেই গো, তুমি যাতে সুখী হও, শান্তি পাও, তাও আমার দেখা কর্তব্য। তোমার সুখ আমার সুখ—তোমার দুঃখ আমার দুঃখ।

কিছুদিন পর একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে এনে পারুলের কোলে তুলে দিয়েছিলো মুকুল, 'আমাদের সন্তান—'

উল্লসিত হয়ে ওঠে পারুল, 'খুব চমৎকার দেখতে—'

দু'জনেই খুশী হয়েছিলো তারা। এক অনির্বচনীয় আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো সে সময়। আজও রামগোপাল জানে না, তারা নকল মা-বাবা। ছেলেটা ভাগ্যবান। তারা ত জানে, ছেলেটা কোথায় কিভাবে পাওয়া গেছে—মুকুলই শুনিয়েছে সে-কাহিনী।—তবু যেন ছেলেটা তাদের নিজের ছেলেরও বেশী।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অতি প্রত্যুষ।

একটা জরুরী কাজে বেড়িয়েছে মুকুল। গাড়ী চালাচ্ছে জোর স্পীডে। রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই হেড লাইটের আলোতে চোখে পড়লো একজন স্ত্রীলোক একটা শিশুকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে উদ্যত।

গাড়ীটা থামিয়ে ফেলে মুকুল।

মহিলা ভয় পেয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে নবজাতককে ঢেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাড়ী থেকে নেমে মুকুল ধমকে ওঠে, 'কে তুমি? এত ভোরে এখানে কেন?'

'আমার পরিচয় আমি ছাড়া কিছু নেই। এখানে কেন জিজ্ঞেস করবেন না বাবু, তবে এটুকুই বলি, 'আমি মা হয়েছি, কিন্তু সন্তান কাছে রাখবার ক্ষমতা নেই?'

'আমাকে ভিক্ষে দেবে, ছেলেটা?'

নিজের সন্তান কি কেউ কাউকে ভিক্ষে দেয় বাবু? তবে আমি অভাগিনী তাই—'

ভেজাল মনটা মুহূর্তে নরম হয়ে ওঠে মুকুলের ঐ হতভাগিনীর কথা শুনে। পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল হাতে দিয়ে বলে, 'এটা নাও—'

একটা হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বলে, 'কি এটা, বাবু?'

'টাকা—'

বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটি বলে, 'টাকা? এ যে অনেক টাকা!'

'হুঁ—পাঁচশো—'

'হয়ত সেদিন এ টাকাটা পেলে আমার বিয়ে দিতে পারতেন বাবা, কিন্তু পাঁচটা টাকা বের করবার ক্ষমতা ছিল না যাঁর—' ছু-পাশে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মেয়েটি। তারপর

ছেলেটাকে রাস্তার মাঝে শুইয়ে দিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা মুকুলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অক্ষমতা সত্ত্বেও সে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় একটা গলির মধ্যে দিয়ে।

মুকুল নবজাতক শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো, তারপর টাকার বাণ্ডিলটা। মেয়েটির কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল, বাবার দারিদ্র্যের জন্য তার দিদির বিয়ে হয়েছিলো অসৎ পাত্রে আর এর বিয়েই দিতে পারেনি তার বাবা। আজ সে যে জীবন যাপন করে তার জন্য দায়ী কে ?

হৃষ্ট মনে বাড়ী ফিরে এলো মুকুল জরুরী কাজ ফেলে রেখে।

॥ দশ ॥

অতীতের কথা স্মরণ করে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। অতীত আর ফিরে আসে না সত্য, তাই অতীতের অভ্যন্তরে মনটাকে প্রবেশ করিয়ে একটা অনির্বচনীয় মধুর স্মৃতি মন্থন করে সাময়িক ভাবে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি তাতে মনের অবক্ষয়ও হয় বেশ কিছুখানা। অকপটে মনের দর্পণে অতীতের ছবি প্রতিফলিত করে অনুশোচনার ধিক্কারে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বুকের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি বুভুক্ষু অন্তরের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ করা ছাড়া কি বা লাভ? তবু যেন অতীতের ভাবনা-ব্যাকুল মন মুহূর্তে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সময় সময়। মনের বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন বয়সে যে রকমারি পথে পরিচালিত করে রঙীন কল্পনায়, তার জন্য দায়ী নিজেকে করা ছাড়া কাউকে দায়ী করাও যায় না। —অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় পারুল, এই অজানা অদৃষ্ট!

কাঁদছে আকুল হয়ে পারুল। স্বামীহারা হয়ে এ-রকম কান্না কেঁদেছিলো। হৃদয়ে গাঁথা আছে সে-কান্না। আজ আবার কাঁদলে, সে মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করে। ভুলা যায় না তাকে; তার স্মৃতিকে। প্রথম যৌবন আর প্রথম প্রেম ভোলবার নয়। হয়েছে কত আইন প্রণয়ন, মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধ আইন। কিন্তু আজও সে ভুলতে পারে না প্রথম স্বামীকে। পারবেও না ভুলতে এ-জীবনে। সব পেয়েছে সে—মানুষ যা' চায় তাই; কিন্তু পেয়ে ত শান্তি নেই। এতদিন তলিয়ে বোঝেনি, আজ এ প্রৌঢ় বয়সে বার বার যেন মনে হয়, সেই ভাল ছিলো। সেই ছিল সুখের। সেদিন তার বড় সাধের, বড় সুখের। প্রথম প্রেমিককে হারিয়ে নতুন প্রেমিকের মন জুগিয়ে চলা, তার সব কিছু ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া বড় কঠিন। অন্তর যেন মনে-প্রাণে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। সেদিন

বালীগঞ্জের লেকে যে ভুলের করেছে সে ভুল সংশোধনের আর উপায় নেই। অদৃষ্টে সুখ না থাকলে এমনিই হয়। অন্যায় অবিচারের সাজা আছে। মানুষের নজর এড়িয়ে গেলেও বিধাতার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যায় না বলেই সে পরজন্মের কোন পাপের ফল ভেবে তার বৈধব্য-দশা মেনে নিয়েছিলো। আবার যত সহজে সেদিন সে মুকুলকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলো আজ তত তুচ্ছ কারণেই তার মনের আগুন আবার জ্বলে উঠেছে এ-মুহূর্তে। পূর্ব-স্মৃতির পুনরাবৃত্তি ভাল লাগছে না তার। কেবল মনে হচ্ছে, আবার ডাক ছেড়ে কাঁদে সেদিনের মত, 'কোথা গেলে গো তুমি—'।

অন্তরের সুদূরতম প্রদেশে যে তৃষ্ণা ছিল, আজ তা' মিটে গেছে মনে হয় পারুলের। আজ চাওয়া-পাওয়ার সীমান্তে এসে খুঁজছে কি যেন ব্যাকুলতায়। অবশ্য যে যাকে যত ভালবাসে তার তত সামান্য কথায় আঘাত পায় সবচেয়ে বেশী। তাই সে সইতে পারছে না মুকুলের কটু কথাগুলো। যেন হুল ফুটছে সর্বাঙ্গে। কথাটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে কি হতো ? তা' না বলে যুগান্তরের মসী-মাখা ঘৃণিত কুৎসিত জীবনের পুনরাবৃত্তি ! আত্ম-অহমিকার এ-এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত। অবশ্য একদিন সে ভালবেসেছিলো মুকুল সর্বাধিকারীকে নয়, তার চেহারাটাকে। সুন্দর সুঠাম লালিত্যমাখা দেহটা ছিল তার কাছে লোভনীয়। দেখলে চোখ ফেরানো যেতো না। যৌবনে চঞ্চলতা বশতঃ বাসা বেঁধেছিল দেহাশ্রয়ী প্রেম, কিন্তু মনের একান্ত গোপনে সত্যকার যে প্রেম, তা' ছিল অজানা। তাই বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন গোপনে, 'শুধু চেহারা দেখলে চলে না, তার গুণাগুণ, শিক্ষাদীক্ষার কথাও ভেবে দেখতে হবে। তাদের মিলন শুভ হবে কিনা !'

গাড়ী-বাড়ী-টাকা !—আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেয়েছে মুকুল। অন্ততঃ তাই সে মনে করে। কিন্তু ভেবে দেখতে রাজী নয়, চাঁদের কলঙ্ক বিশ্বজন জানে—জানে তার কলঙ্কমাখা কাহিনী !

সুশীলকে সে সত্যই ভালবেসেছিল। তার মহৎ হৃদয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ তার কাছে আরো মহীয়ান হয়ে উঠেছে। প্রাণ বলি দিলে শেষে জনসাধারণের স্বার্থে। শুনলে না বাপের নিষেধ। মুখের ওপর তীক্ষ্ণ শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিলে, 'বাজারের ধনী ও সেরা ব্যবসায়ী হিসাবে আপনি নাম করেছেন যেমন ঠিক তেমনি ভেজাল ও দুর্নীতির কারবারে সিদ্ধহস্ত—একথা শুধু আমি নই পাঁচ বছরের একটা শিশুও জানে। আপনি সংযত হন নচেৎ আমাকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। কেন না দেশ শুধু আমার আপনার নয়, জনসাধারণের। তাদের দাবী মানতে হবে—'।

'যদি না মানি ?'

'দমদম দাওয়াই, প্রয়োগ করতে হবে।'

'সে আবার কি ?'

'সংবাদপত্র শুধু কেনাই হয়,বাজার দর ছাড়া বুঝি কিছু পড়েন না ?'

তোমার ঔদ্ধত্য স্পর্দার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সুশীল !

'সেজন্য দায়ী আপনি' !

'এ কথা তুমি আমার মুখের সামনে বলতে পারলে ? তুমি আমার একমাত্র সন্তান তোমার মুখ তাকিয়ে আমি কিনা করছি ? অথচ তুমি আমাকে জন কয়েক বেকার যুবকের প্ররোচনায় অপমান করতে সাহস কর ? লজ্জা করে না তোমার। দলনেতার অভিনয় করতে ?'

আপনি ভুলে যাচ্ছেন, এ অভিনয় নয়, সত্য। আজ হোক কাল হোক সত্যকার অভিনয় জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চে অবিলম্বে দেখতে পাবেন। প্রস্তুত থাকুন দমদম দাওয়াই অভিযানের বিরুদ্ধে লড়তে—।

বাপের প্রাক্তন জমিদারী আভিজাত্যের অহঙ্কারের রক্তিম পয়সা তখন পর্বত প্রমান। সাধারণ মানুষের কাছে আমাকে হেয় হতে হবে ? তুমি পুত্র হয়ে তাতে সাহায্য করতে চাও ?—যাও, কিন্তু

তোমার প্রাণ যদি আমার পোষা গুণ্ডাদের অস্ত্রাঘাতে যায়, আমি দুঃখিত হবো না—ভগবান যেন সেজন্য আমাকে তোমার প্রাণ বলির জন্য দায়ী না করেন। মনে রেখো আমি মনীশ মজুমদার—জেলার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, আর ওপর মহলে আমার খুঁটির যোগাযোগ বড় কম নয়, ! বৌমা বৌমা—'

বেড়িয়ে আসে পারুল। সেও শুনছিলো জানালা দিয়ে পিতা পুত্রের বচসা। এসে প্রণাম করে শ্বশুরকে।

মনীশবাবু করুণকণ্ঠে বলেন, 'আমি ওকে শান্ত করতে পারছি না মা। যা কিছু করছি সবই তো তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ও তা আজও বুঝলে না। শহরের দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের তো তুমি জান, ওরা আজ পর্যন্ত কোথাও হেরে আসেনি, ওরা যে কালও এ হামলা-রণে হারবে না—সে আমি জানি। তবে ও আমার পুত্র কিনা, তাই ভয় হয়, হয়ত ও আর ফিরে আসবে না। আর ওকে ফিরে পাব না—' সরবে কেঁদে ওঠেন এবার ভেজাল ও দুর্নীতি কারবারে সিদ্ধহস্ত মনীশ মজুমদার।

পারুলকে সব বুঝিয়ে সুশীল যখন অহেতুক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও ভেজালের বিরুদ্ধে লড়তে বদ্ধপরিকর জানালে এবং হাতে নাতে প্রমাণ করিয়ে দিলে পিতার ব্যবসায়ে ধারণাতীত অর্থাগম হচ্ছে, পারুল না বলতে পারলে না। সুশীলকেও বাধা দিতে পারলে না। শুধু নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালো, 'ভগবান ওকে জীবিত রেখো। সেদিনের স্বপ্ন যেন তার নিষ্ফল হয়।'

জীবিত ফিরে আসেনি সুশীল। তার প্রাণহীন বীভৎস মূর্তিটা যখন বাড়ীর প্রাঙ্গণে আনা হলে, মনীশবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, ভুল করেছি আমি—ভুল করেছি উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব বজায় রেখে। ভেবে দেখিনি,—যুগ বদ্‌লেছে। উঃ—

এরপর পারুল ফিরে এলো পিতৃগৃহে। মা-বাবা চলে গেলেন তিন বছর আড়াআড়ি। দাদার গলগ্রহ হলো সে। তারপর সে

গলগ্রহ থেকে রেহাই পাবার জন্যে নতুন করে মনে প্রাণে জেগে উঠলো, প্রেম-সুখ-ভালবাসা মুকুলের আন্তরিকতায় ···দ্বিতীয় জীবন শুরু করলে, তার সঙ্গে সব কিছু ভোগের আশায়। যা সে পায়নি অথচ পাবার ব্যাকুলতা মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিলো সুশীলের মৃত্যুর পর থেকেই। দেনা-পাওনার হিসাব মেলাতে বসেছিলো সে, কিন্তু ভেবে দেখেনি সেখানে সব নকল, মনের মানুষটি পর্যন্ত নকলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, এখানে সব ভেজাল। ভেজাল দিয়ে ব্যবসায়ী লাভবান হয় বটে, কিন্তু ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ আগিয়ে যায়, নানা ব্যাধিতে জ্বলে পুড়ে মরে। সেও তেমনি আজ এক অগ্নিহীন চরম চিতাতে যেন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে, মৃত্যুর দিকে আগিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে।— ভেজাল প্রেম দুর্বিষহ!

এ প্রাণটার জন্য আর মায়া হয় না। অথচ যেদিন দেহে ফুটে উঠলো নতুন কুঁড়ি, যৌবন ডাক দিয়ে গেল দেহের প্রতিটি কণায় কণায়, হৃদয় উঠলো নেচেময়ূরীর মত, সে আবেগপ্রবণ মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তার শুভাগমনে। ধন্য হলো বুঝি জীবন। স্বর্গ পেল বুঝি হাতে। আপনাআপনি কার অজানা তুলির টানে মুখর হয়ে উঠলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ—কেশপাশ থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত। মধুর স্বরে দেহ-মনের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বীণা বেজে উঠছে যেন অবিরাম।

রূপবতীর রূপ ফুটে উঠলো। পারুল গর্ব অনুভব করল। সে রূপের পূজারী হবে কে? কে তার এমন রূপেরমূল্য দেবে? কোন্ রূপবান? চলতে থাকলো তার দেহ-মনের অনুশীলন আরও নিখুঁত ভাবে। মনভ্রমরা গুনগুন করছে সদাসর্বদা মনের গোপন মন্দিরে। শিবপূজার সময় বাড়িয়ে দিলে সে যদি শিব সন্তুষ্ট হন, তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শিবমন্দির ধূপদীপ, পূজা স্তোত্রে মুখর হয়ে উঠলো। ভ্রমরের অলক্ষ্যে ভ্রমরীর চললো এভাবে একটানা সাধনা। মনের মানুষ চাই নিখুঁত—সুন্দর।

তারপর ভ্রমর এলো তার জীবনে। পিতামাতার যত্নে তার দীর্ঘদিনের মনোস্কামনা পূর্ণ হলো। মনে মনে যে মানুষটিকে ভালবাসার একটা অংশ দিয়েছিলো সবার অজ্ঞান্তে তার চেয়ে কাছের মানুষটি অনেক ধনী, উচ্চ শিক্ষিত—রূপে যা' সে একটু খাটো। মন তার বহু উচ্চে। সে ধনী হয়েও অর্থপিপাসু বা স্বার্থান্বেষী নয়, চায় দরিদ্রের মুখেও হাসি ফোটাতে।

মুখের হাসি আর মনের হাসির বহু তফাত। দুইয়ের যোগাযোগ যে হাসি ফুটে ওঠে মুখে, সে হাসি কত সুন্দর। সে প্রশান্ত হৃদয়ের হাসির রূপ আলাদা। মানুষের আকৃতিই মানুষ নয়, মানুষের মত মানুষ কজনই-বা হতে পারে? মানুষ হতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। যে অনাবিল প্রেম তিলে তিলে বহু অনুশীলন, কৃচ্ছ্রসাধন করে জন্মজন্মান্তর ধরে আয়ত্ত করতে হয়। ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়।

হেসেছিলো সুশীল একদিন তার কাছে। সে মধুর হাসি আজও তার নির্জীব ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে।—অথচ তা' কত করুণ!

'পারুল আজ একটা খুব মজার স্বপ্ন দেখেছি!'

'কি স্বপ্ন?'

'শুনবে?'

'মজার স্বপ্ন শুনতে ইচ্ছে হয় না বুঝি?'

'আচ্ছা, স্বপ্ন সত্য বলে মনে হয়, তোমার?'

'বোধহয়, না—'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সত্য না হলেও একদিন তা' সত্যে পরিণত হবে! অবশ্য যদি তা' তোমার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে আমি তাতে খুব সুখী হবো। যদিও আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আমার আরাধ্য দেবতা বলে মেনে নিতে বলি না, তবে যদি কোনদিন মনে পড়ে আমার সমাধিতে সিরাজের বেগম লুৎফা যেমন বিধবা

হলে সমাধি-মূলে অশ্রুজলে পূজা করে গেছে অহর্নিশি, তেমনটি নয়, মাঝে মাঝে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে এসো।—তোমার চাঁপার কলির মত ঐ আঙুলের স্পর্শে ফুলগুলো আমার সামধির বুকে দিলে আমার আত্মা সুখী হবে। ফুলের সুগন্ধে আমি পাব সুখস্পর্শের আস্বাদ। আশীর্বাদ করবো তোমায়, তোমার বাকী জীবন সুখের হোক— পারবে না?'

পারুলের দু-চোখ তখন জলে ভরা।

হেসে উঠলো সুশীল। অনাবিল সে হাসি।

হাসি দেখে পারুলের কান্না গেল বেড়ে।

'আর অমন করে ওসব কথা বলো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি সইতে পারছি না গো! তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক তোমার সমাধিতে আমার ফুল দেওয়া! লুৎফার দুঃখ শুনলে আজও আমার প্রাণ কেঁপে কেঁপে ওঠে, সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় একটা বোবাকান্না। আর হতভাগ্য সিরাজের জন্য হাহাকার করে ওঠে মনটা।—হায় সিরাজ, বুঝি-বা সে শাপভ্রষ্ট দেবদূত।'

পারুলকে কাছে টেনে নেয় সুশীল। চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে বলে, 'কাঁদতে নেই! ছি! থাক্, আমার মনের কথা শুনে যখন কাঁদছো—স্বপ্নের কথা আর শুনতে হবে না—'।

জেদ ধরে পারুল। 'না বললে আমি কিছুতেই তোমাকে উঠতে দেবো না। বলতেই হবে।'

'শোন তবে সে মজার স্বপ্ন—'

কাঁদছো তুমি আকুল হয়ে আমার মৃতদেহের পদতলে বসে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু আমার রক্তাক্ত কলেবর একটা জয়ের উল্লাসে থেকে থেকে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। হাজার হাজার নরনারী আমায় মৃতদেহ দেখবার জন্যে ভীড় জমিয়েছে প্রাঙ্গণে। তাদের মুখে কথা নেই, শোক-প্রকাশের ভাষা নেই। সবার চোখে

জল। কাঁদছে তারা জাঁদরেল দুর্নীতি ও ভেজাল ব্যবসায়ীর পুত্রের মৃতদেহ দেখে। মনে মনে তুলনামূলক বিচার করছে, পিতা-পুত্রের অন্তরের কতখানা পার্থক্য। আর মনে প্রাণে অভিশাপ দিচ্ছে, ধ্বংস হোক দুর্নীতি ও ভেজাল ব্যবসায়ীরা। 'দমদম দাওয়াই' প্রয়োগ হোক পল্লীর প্রান্তর পর্যন্ত। জেগে উঠুক, রুখে দাঁড়াক্ দেশের মানুষ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। কোন দল নয়, ন্যায়পন্থী মানুষের সৃষ্টি হোক ঘরে ঘরে। যে সব খুঁটির জোরে এসব মানুষ বুক ফুলিয়ে দুর্নীতি করতে সাহস পায়, তাদের খুঁটিগুলো চুরমার হয়ে যাক্। কি আশ্চর্য্য দেখো, আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে মরছি তাতে ওদের লজ্জার সীমা নেই। সবাই মাথা হেঁট করে আছে তোমার কাছে। আমার মৃত্যুর জন্য সব দায় দায়িত্ব যেন তাদেরই। আমি দেখছি আর হাসছি। সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। তোমাদের ওপর যে জুলুম হচ্ছে, তা থেকে তোমাদের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছিলাম দলবদ্ধভাবে,—দলনেতা হিসাবে প্রথমে আমার প্রাণটাই গেল, তাতে তো আমি গৌরব বোধ করছি। বরং অন্য কেউ গেলে, লোকে ভাবতো আমি ধাপ্পা দিয়েছি দলকে। চতুর পিতার সুচতুর পুত্র হিসাবে অখ্যাতি হতো আমার উপরি পাওনা। দল থেকে বের হতেও মুহূর্ত বিলম্ব হতো না। ভাই ভগ্নীগণ, প্রাণের মায়া বড় নয়, আগে অবিচারের প্রতিবাদ। আমি ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র না হয়ে যদি তোমাদেরই একজন হয়ে জন্মাতাম? আমার লজ্জা আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, কিন্তু ধন-মান-যশের কাঙাল হতে চাইনি। তাই সে সময় বাজার কমিটির অনুচরদের রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা আমার রণহুঙ্কার দেখে সরে গেছিলো, যায়নি কেবল দুর্ধর্ষ গুণ্ডারা। আমি জানি পেছন থেকে তাদের সাহস দিচ্ছিলেন স্বয়ং আমার পিতা।

সহ্য হয়নি আমার। তাই ছুটে গেছিলাম, এ হতে দিতে পারি না। ঐশ্বর্য লোভে নিরপরাধ মানুষগুলোর বুকে এ শক্তিশেল

প্রতিদিন আমি বিদ্ধ হতে দেবো না। যদি প্রাণবলি দিতে হয়, সেজন্য আমি দুঃখিত নই। কেন অযথা যখন তখন জিনিষ পত্রের দাম বাড়বে, কেন কৃত্রিম অনটনের সুযোগ নিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? অধিকারের অন্যায় অহঙ্কার শেষ করে দিতে হবে। "দমদম দাওয়াই" জিন্দাবাদ।

"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি'—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎগর্জন করি।

(—রবীন্দ্রনাথ)

তোমাকে সব বুঝিয়ে বললাম, তুমি না বলতে পারলে না। শুধু জটাজুটধারী সেই দেবাদিদেব মহাদেবের ফটোতে মাথা কুটতে লাগল, 'ঠাকুর তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো। জমিদারী চাই না আমরা, চাই সব কিছুর বিনিময়ে ওর জীবন ভিক্ষা।'

পারুল ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক। আমি তা' চাই না—চাই না—চাই না—'

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সুশীল, 'তুমি ভেবো না—এ স্বপ্ন সত্য না-ও হতে পারে।'

অথচ সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে পারুলের জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে।—নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলে সে, 'এই তার ললাটের লিখন'।

॥ এগারো ॥

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ফের বলতে শুরু করলে মুকুল,—উনিশ-শো সাত চল্লিশ সাল।

ভারত স্বাধীন হলো।

হঠাৎ একদিন কোন দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এলো আমার কাছে। আমার ফিরিওয়ালা জীবন থেকে আজ কিভাবে এতবড় লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ফাঁদতে পেরেছি তার ইতিহাস জেনে কাগজে ছাপবে তারা।

যে ভেজালের কারবারে সিদ্ধহস্ত, তার জীবনীও যে অধিকাংশ ভেজাল, তা' কাগজের প্রতিনিধি জানবে কি করে? এ গোপন খবর রাখা কজনের পক্ষেই-বা সম্ভব? সুতরাং তারা চাইল নবীন ভারতের জনসাধারণকে আমার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ব্যবসায়ের কথা সগর্বে জানিয়ে আমাকে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশবাসীকে ব্যবসা ইত্যাদিতে উদ্‌বুদ্ধ করবার প্রয়াসী হতে।

আমি আমার ব্যবসা কাহিনীর সঙ্গে ভেজাল দিলাম শতকরা নিরানব্বই ভাগ। জলো না পানসে সে পরখ কে করবে? আর যদিও-বা কেউ করে তারা নিজেরা যে কতখানি নির্ভেজাল তা' হৃদয়ঙ্গম করলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এ বিশ্বাস আমি করি, যেহেতু জহুরী জহর চেনে। অর্থাৎ আমার নকল আমিত্বে একখানা নকল বাঘছাল চাপিয়ে দেওয়া হলো। জানো বোধহয়, সেই গর্দভের বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে কৃষকের ক্ষেতে ফসল নষ্ট করার কথা।

পরদিন সংবাদপত্র দেখে আমার ব্যবসায়ী গুরুরা ফের আর এক-দফা পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল, 'সাবাস'।

কোন মাসিক পত্রের সম্পাদক ধরলে, ধারাবাহিক ভাবে আমাকে জীবনী লিখতে হবে।

আমি বলি, 'সম্ভব নয়—।'

তিনি বলেন, সেকথা বললে শুনছিনে স্যার, আমরা 'পেপার' পড়ে বুঝেছি, সামান্য পুঁজির ব্যবসা থেকে কি ভাবে আজ লাখ-লাখর টাকার ব্যবসা ফেঁদেছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, দেশে মানুষকে ব্যবসায়ের সে ইঙ্গিত দয়া করে জানাবেন। আজ আপনি দেশের একজন খাঁটি ব্যবসায়ী। আপনার নাম দেশে কেন বিদেশেও পৌঁচেছে। নবীন ভারত গড়তে আপনাদের সাহায্য চাই—চাই আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নবীন ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে উদ্‌বুদ্ধ করতে। শুধু চাকরি নয়, ব্যবসা করেও যে মানুষ বড় হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনি! তা' থেকে দেশকে তথা নবীন ভারতকে বঞ্চিত করবেন কেন? শিশুরাষ্ট্র গড়তে কি আপনার কোন অবদান আশা করতে পারি না?'

'লেখা তেমন আসে না কিনা আমার।'

কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কি সাহিত্যিক যে আপনার কাছে কথাশিল্প আশা করবো? তবে দয়া করে একটু অবসর করে মাসে একদিন করে আমাদের প্রতিনিধির কাছে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু বলবেন; তিনি ঠিক গুছিয়ে লিখে নেবেন—মানে ধারাবাহিক ভাবে বেরোবে কিনা কাগজে?'

বুঝলাম, আমার স্বরূপ ওরা আসল বলে বাজারে ছাড়বে। আমার অক্ষমতার কথা বুঝলেও সাধারণের কানে তুলতে রাজী নয় এরা। ভেজাল দিয়ে আমাকে হয়তো কোনদিন সাহিত্যিক বলে চালিয়ে দেবে সাহিত্যিকদের আসরে কিংবা কোন সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি বা প্রধান অতিথি হবার অনুরোধ জানাবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা আমি তেমন ভাবি না। আজও ভাবলাম না। ক'লাইন বলতেই সম্পাদক মশাই 'নোট' করে নিয়ে সুখ্যাতি

করে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক্। বড় চমৎকার বললেন স্যর, কলম ধরলে আপনাকে পাকা সাহিত্যিক বলেই মনে হবে। আবার একমাস পর আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি এসে কিছুক্ষণের জন্য বিরক্ত করবে আপনাকে, আজ গৌরচন্দ্রিকা হয়ে থাক। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।' বলে তিনি ব্যাঙ্কের একখানা চেক টেবিলে রেখে বললেন, 'আপনার দক্ষিণা'।

দেখলাম একশো টাকার চেক!

কাগজ বের হতেই একখানা বিনামূল্যে পেলাম। পড়ে দেখলাম, আমি যা' বলিনি তারই বেশীর ভাগ। আমার আসল চাপা দিয়েছিলাম, নিজেকে জাহির করবার জন্যে, সম্পাদক মশাই সেটাকে আরও চাকচিক্য করতে গিয়ে আমার আসলের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।—আমি বুঝি রূপকথা রাজ্যের মানুষ।

দৈনিক পত্রিকা সংক্ষেপে একটা স্তম্ভ ছেপেছিলো, এরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোটা ব্যবসায়ী জীবনী ছেপে আমাকে শুকতারার মত উজ্জ্বল করে তুলতে চায় ব্যবসায়ী জগতে। আমি বাধা দিলাম না। আত্মপ্রশংসা কে-না শুনতে চায়, হলোই বা তা' ভেজাল!

অর্থের কাঙাল ছিলাম আমি। যশ-মান চাইনি বা পাইনি জীবনে। তা'ও ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টিতে এসে গেল। লোকচোখে আমি হলাম আদর্শ ব্যবসায়ী। সুতরাং ব্যবসায়ী মহল আমাকে তাদের সমিতির একজন হোমড়া-চোমড়া সভ্য করে নিলেন এবং দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে আমাকে তাঁরা বিধান সভার সভ্য নির্বাচনের জন্য আগে ভাগে তৈরী থাকতে বললেন। অমি না-না করতেই তাঁরা জয়ঢাক বাজিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। আমি কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

পারুল বললে, 'ক্ষতি কি? এতে ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হবে না আর এরও প্রয়োজন আছে, যেহেতু রাজনৈতিক মহলে ঘনিষ্ঠতা তোমার নকল জীবনে রক্ষা কবচের ন্যায় কাজ করবে। তোমার

আসলটা চেপে গিয়ে তোমার নকলের জয়গান প্রচারিত হবে। কে তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে? তুমি অমত করতে পারবে না।'

মুকুল ধন্যবাদ দিলে পারুলকে, 'এ রকমটি না হলে সহধর্মিণী! তুমি বুদ্ধিমতী। আজ তোমাকে একছড়া মুক্তার মালা উপহার দিচ্ছি—চলো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হলো।

যারা কস্মিনকালে মুকুলের নাম জানত না, চিনত না, তাকে তারা টাকার জোরে বানিয়ে তার সাত পুরুষের নাম কতদিনের চেনাজানা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান ইত্যাদি সরবে প্রচার শুরু করলে। এবং সে-সঙ্গে ব্যবসায়ে বিরাট সাফল্যের কথা গগনভেদী চীৎকারে মুখরিত করে তুললে। পাড়ার লোকগুলো 'থ' বনে গেল। টেলিফোনে ও সাক্ষাৎকারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে, 'যা-হোক মশাই, এমনি করে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন? আপনি এতবড় মানুষ, দেশের জন্য এতখানা করেছেন, সেকথা কি আমাদের জানতে দিতে নেই? বহু পুণ্যফলে আমরা আপনার মত লোককে বিধান সভায় পাঠাতে পারবো আশা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো। ধন্যবাদ।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আত্মপ্রচার সুখের, তার পেছনে যদি থাকে জয়ঢাক, সে হলো আরও তৃপ্তিকর। নিজেকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আর এ না হলে নাম জাহিরও বৃথা হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, মুকুলের তখন ব্যবসায়ে তেমন দৃষ্টি দেবার সময় নেই। প্রাইভেট সেক্রেটারী, ম্যানেজারদের ওপর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে সে তখন লাটাইয়ের মত ওয়ার্ডের বিভিন্ন পার্ক ও ময়দানে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছে। সভাপতি, প্রধান অতিথির স্থান অলঙ্কৃত করছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীর দেওয়াল, লাইটপোষ্ট, পথচারীদের ব্যবহার্য নর্দমা, রিক্সা-ঘোড়াগাড়ীর পেছন, বড় বড় বৃক্ষের গুঁড়ি পর্যন্ত

মুকুল সর্বাধিকারীর নির্বাচনে সাফল্যের জন্য লাল মোটা মোটা হরফের জাহ্নু সগৌরবে প্রচারের সাহায্য করছে। নির্বাচনে ব্যবহার্য গাড়ীগুলোএমনকি তার গাড়ীখানা পর্যন্ত যে কোন রঙের তা'ও সাধারণের বুঝবার উপায় নেই, আসল রঙ চাপা পড়ে গেছে পোষ্টারের অভব্য ব্যবহারে।

মনের ভেতরটা যার পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ, তার কাছে দৃষ্টিকটু বলে কিছু নেই। ওপরের চাকচিক্যই মনের মাপকাঠি বলে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তারপর আছে মন কেড়ে নেবার যাদুমন্ত্র— ভাষার ইন্দ্রজাল। বাক্য বিন্যাসের অপূর্ব কৌশল। চাটুকারদের যথাস্থানে স্তবস্তুতির চমৎকার প্রয়োগ।

ভোটারদের মন জয় করে ফেললে মুকুল। প্রমান তার ব্যালট বাক্সগুলো। ভোটপত্রে প্রায় ঠাসা। অবশ্য বিনিময়ে সে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশ থেকে নাকি সে ভেজাল-দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে চেষ্টা করবে, তার আন্তরিক ইচ্ছা দেশোন্নয়নে আত্ম-নিয়োগ, তাতে ব্যবসায়ে কিছু ক্ষতি হলেও।

বিজ্ঞব্যক্তিদের কাছে এসব কথা ভূতের মুখে রাম নাম মনে হলেও মৃদুহেসে সাবাস দিলেন সর্বাধিকারীকে এবং আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের দাবি পেশ করে উৎসাহিত করলেন তাকে।

নির্বাচনী সফর এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় ও নির্বাচনে জেতবার জন্য ভাড়া করা মানুষদের পেছনে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় সার্থক হলো সর্বাধিকারীর। বেতার ও সংবাদপত্র নাম ঘোষণা করলে।

॥ বারো ॥

এরপর সে কতখানি দেশের জন্যে আর কতখানি নিজের জন্য কাজ করেছে, সে-সবের হিসেব-নিকেশ কেউ করলে না বরং তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় পাঠাবার দৃঢ় সংকল্প করলে। প্রথমটা 'না-না' করলে মুকুল। ব্যবসায়ে নাকি এসব সময় ব্যয়ে বেশ কিছু ক্ষতি হচ্ছে তার। অতএব সে আর লোকসভার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু পারবে দেশের কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করবার প্রতিশ্রুতি দিলে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা স্তাবকেরা ছাড়লে না। বরং উঠে পড়ে লাগলো এবং তার আগামী জন্মদিনে সভা ডেকে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনার দিন স্থির হলো।

সেদিন ছিলো মুকুলের জন্মদিন। কবে কোন অন্ধকার তুল্য ঘরে দারিদ্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কেউ জানে না। অথচ জন্মদিনের ঘটা পালন কেন সাড়ম্বরে হচ্ছে সেকথা জানতে হলে বিশিষ্ট নাগরিকদের লোকসভা নির্বাচনের মুখে তার এমন একটা শুভ জন্মদিনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি নাকি অনেককে উৎসাহিত করবে তাই এ প্রকৃষ্ট পন্থায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অবশ্য একথা ধুরন্ধর ব্যক্তি মাত্র জানেন।

মুকুল অনেক ভেবে চিন্তে জন্মদিনটা হিসেব করে বের করেছে। ছোটবেলায় তার মা বলতেন গল্পচ্ছলে,—

শ্রাবণ মাস।

আকাশ দু'দিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। ঠাণ্ডার প্রকোপে চাষীরা পর্যন্ত ঘরের বাইরে যেতে পারছে না—পৌষের শীত যেন ভুল করে শ্রাবণে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনিধারা এক

সাতই শ্রাবণ মুকুলের জন্মদিন। যে ঘরটায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, জলে ভেসে যাচ্ছে। গতবার কিভাবে যেন খড়ের গাদাটা পুড়ে গিয়েছিলো, সেজন্য আর ঘর ছাওয়ানো হয়নি। গরীবের মেয়ে ছোট থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে সুপরিচিতা, তাই তাঁর সেসব কষ্ট কষ্ট বলেই মনে হচ্ছিলো না। তা' ছাড়া অধিক বয়সে মুকুলই তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান। কত দেবতার কাছে মানত, সাধু-সন্ন্যাসীর কবচ ধারণ করেই তাঁর এ অভীষ্ট বস্তু সিদ্ধ হয়েছে সুতরাং মায়ের প্রাণে এসব কষ্টের কোন মালিন্যের ছায়াও স্পর্শ করেনি।

খুশী হলেন মুকুলের বাবা। সেদিনই মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সন্তানের জন্য দীর্ঘ পরমায়ু, ধন-মান-যশের প্রার্থনা জানিয়ে নামকরণ করলেন 'মুকুল—'

মা আপত্তি করেছিলেন, 'ঠাকুর দেবতার এত নাম থাকতে মুকুল নাম রাখতে গেলে কেন ?'

'গাছের কচি শাখার কোলে মুকুল দেখা দেয়, তারপর ধরে গুটি, এরপর ফল—' বুঝিয়ে বললেন তিনি স্ত্রীকে।

'মুকুল—আমার প্রাণের মুকুল—' সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছিলেন সন্তানকে। বেঁচে থাক্, সুখী হোক, এ আশীর্বাদও জানিয়েছিলেন মনেপ্রাণে। গরীবের পক্ষে ধনী হ'বার আশীর্বাদ কাজে লাগবে না ভেবে হয়তো আশীর্বাদ করতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। তবু ডাগর ডাগর চোখ ঢুটোর দিকে চেয়ে মনে বোধহয় ভেবেছিলেন, 'এ ছেলে একদিন অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে। কি মিষ্টি চেহারা।'

মায়ের অন্তরের আশীর্বাদে কার্পণ্য থাকে না। আশীর্বাদে দোষ কি ? দীর্ঘদিন পর পুত্রপ্রাপ্তি প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন ভগবান এসব ভেবে মা ছেলেকে গভীর আবেগে বুকে টেনে নিলেন, গায়ে ঢাকা দিলেন তাঁর পরনের কাপড়ের ছিন্ন মলিন অঞ্চলটুকু। বক্ষ সংলগ্ন করে দেহের উত্তাপ দিয়ে শিশুকে রক্ষা করলেন ঠাণ্ডার হাত থেকে। আজ তাঁর মন খুশীতে ভরা।

প্যাণ্ডেল সাজানো হলো নামকরা শিল্পীদের দিয়ে। ভাড়াকরা ফটোগ্রাফার বিভিন্ন ভঙ্গীর ফটো নিচ্ছেন মুকুলের। সাংবাদিকরা যথা সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ না করার জন্য ধৈর্যচ্যুত। তাঁরা বহু পূর্বেই মুকুলের সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত জীবনী হস্তগত করেছেন, বাকী মাত্র আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও যাঁদের নাম সংবাদ-পত্রে না ছাপালে সংবাদপত্রের ওপর খড়্গহস্ত হন, তাঁদের নাম ও ভাষণের মামুলী সালসার সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ নোট করা।

এক ঘণ্টা দেরি করে বেলা ন'টায় মাইক ঘোষণা করলে অনুষ্ঠান পরিচিতি।

আজও বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা মাইকের সাড়া পেয়ে হল্লা করে দেখতে যায়, কি হচ্ছে,—আবার দু-চারখানা গান হলে রাজ্যের ভিখারীগুলো মনে করে কোন ভোজকাজ হচ্ছে। অবশ্য শোযোক্তদের পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য আজকের এ অনুষ্ঠান নয়। কালোবাজারী টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাকারী মুকুল সর্বাধিকারীর পুণ্যময় দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সমবেত ভদ্র-মণ্ডলীর ৺ভগবৎ সমীপে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা ও লোকসভার প্রার্থী হিসাবে সর্ব সম্মুখে উপস্থাপিত করা। যারা এ সবের হোতা তারা এরকম একজন মুরুব্বী পেয়ে ধন্য। তার ওপর ভুঁড়ি ভোজন, নির্বাচনী দাঁও—সেসব তো আছেই।

যা' হোক অনুষ্ঠান পরিচিতির পর উদ্বোধন সঙ্গীতের ধাক্কায় বেশ কিছু বাজে লোক গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়েছে তখন। হাড় হাভাতে অর্ধ উলঙ্গ ভিখারীগুলো এঁটো পাতা চাটবার তালে নির্লজ্জের মত এসে প্রহর গুনতে শুরু করেছে—তারা জন্মদিনের অর্থ বোঝে না'—জন্ম থেকে শুধু পেটের জ্বালা বুঝতে আর হ্যাংলার মত এঁটো পাতা চাটতে শিখেছে।

এ হেন অনুষ্ঠানে অদূরে হ্যাংলাগুলোকে দেখে কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হলো মুকুলের। অবশ্য সে মুখে কিছু বলতে পারলে না জন্ম-

দিনের প্রফুল্ল ভাব বজায় রাখবার জন্যে। পারুল অতিথি অভ্যাগত-দের ·আদর আপ্যায়ন করছিলো প্যাণ্ডেলের ওপর সুশোভিত কার্পেটের ওপর মখমলের জুতো পায়ে দিয়ে। আজ তার বেশবাস স্বর্গের ইন্দ্রাণীকেও হার মানিয়েছে। স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে কাছে গিয়ে কানে কানে বলে, 'শুধু একটা দিন সহ্য করতে পারবে না—থাকলেই-বা দাঁড়িয়ে?'

মুকুল সম্মতি দিলে। জানি না আর কেউ সেসময় হ্যাংলা-গুলোকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল কিনা। তবে ধৈর্য ধরে লজ্জার মাথা না খেলে নাকি এরকম অনুষ্ঠানে যোগদান অসম্ভব! —ধৈর্যের জয় হোক!

কোন একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর সভাপতিত্বের কথা ছিল আজকের এ অনুষ্ঠানে। তিনি ঘণ্টাখানেক আগে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন, তবে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন হৃষ্টকণ্ঠে। অগত্যা কর্পোরেশনের একজন হোমড়া-চোমড়া কাউন্সিলারকে সভাপতি করা হলো। —প্রধান অতিথি অবশ্য যথাসময়ে পৌঁছেছিলেন। অপ্রধানরা দিব্য প্রফুল্ল বদনে স্ব-স্ব আসনে, কেউবা জায়গা না পেয়েও নিজগুণে গুণান্বিতের নমুনা স্বরূপ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন অধৈর্য না হয়ে।

সভার কাজ আরম্ভ হলো।

রকমারী ফুলের মালা, শ্বেত চন্দন, ধান-দূর্বা, ধূপ-দীপ, শঙ্খ-ধ্বনির আয়োজন পূর্ব থেকেই ছিলো—সেসবের সদ্ব্যবহার হলো ধুরন্ধর মানুষদের দিয়ে।

পূর্ব-প্রস্তুতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ক'জন মুকুল সর্বাধিকারী-ভক্ত বক্তা গুণগানে মুখর হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ দাতাকর্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে, দেশের ক'জন মহামানবের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেশের কল্যাণের জন্য তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু লাভের জন্য প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা জানালেন গদ্‌গদ্ ভাষায়। মাঝে মাঝে স্তাবকদের গগনভেদী

করতালিতে পার্কের ক'টা পাখী ভয়ার্ত হয়ে উড়তে লাগলো। বুঝিবা প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে !

কেউ জানতে পারলে না, গণ্ডির বাইরে এক কঙ্কালসার সন্তানের জননী শীর্ণ হাতের স্নেহ স্পর্শে নামকরা সর্বাধিকারীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনারত বিভিন্ন বক্তার সুরে সুর মিলিয়ে তার সন্তানকে আজকের দিনে আশীর্বাদ জানালে অন্তর মথিত অশ্রুজলের সাথে।

বেশ মনে আছে হতভাগা জননীর, আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে এমনি দিনে এ ছেলেটি জন্মেছিলো। সেদিন তারা অন্য এক শহরে ছিলো। জ্যোৎস্না ধারায় পৃথিবী যখন হাসছে ঘোমটা ঢাকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে—বসতিহীন শহরের শেষপ্রান্তে একটি গাছের নীচে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিলে নিরাশ্রয়া জননী।—একটি পারিজাত ফুলের সৌরভ যেন তার মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে তুলেছে তখন। সদ্য প্রসূতির কোন কষ্ট কষ্ট বলেই বোধ হচ্ছে না তখন। চোখ-মুখে তার আনন্দের ছাপ, অন্তরে জ্যোৎস্না ধারার প্লাবন।

গরুর দুধ নেই, হরলিক্স নেই, প্রসূতি বা শিশুর পরিচর্য্যা করবারও কেউ নেই। আছে শুধু মাথার ওপর খোলা আকাশ, বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদ আর ক্ষীণাকার মাতৃস্তন। স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ শিশুর মুখে যাচ্ছে, চুকচুক করে টানছে, মিটিমিটি চাইছে আর মাঝে মাঝে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। জানতে পারছে না সে, কোথায় এলো, জীবনটা তার পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগবে! সবচেয়ে বড় সমস্যা ক্ষুধার অন্ন কি ভাবে জুটবে ?

শিশুর পিতা ধারে পাশে ছিলো। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বৃক্ষতলে মাতৃঅঙ্কে শায়িত শিশুর মুখ দেখলে। চোয়াল বসা গাল দুটো আনন্দে ফুলে উঠলো কিনা বুঝা গেল না, শুধু বিড়বিড় করে বললে, 'ভগবান, ভিক্ষুককুলকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমার এত দয়া কেন ?'

ভগবান শুনলেন কিনা জানি না, কিন্তু তার কিছুদিন পর নানা কারণে শিশুর পিতা তাহাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহ নাকি অকৃপণ। তাই সে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভিক্ষা করে যেদিন যা' জোটে তুজনে ভাগ করে খায়। কখনো কোলে, কখনো পিঠে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ফেলে পালাবার কল্পনাও করতে পারে না—সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিশু ক্রমশঃ দিন-মাস-বৎসর অতিক্রম করে বড় হ'তে থাকে। তবে তাকে পাঠশালা যেতে হয় না, উলঙ্গ হয়ে থাকার জন্যে কেউ তিরস্কার করে না, বাসী-পচা, এঁটো পাতা চাটার জন্যেও কেউ অসুখ-বিসুখ হবার ভয় দেখায় না—অর্থাৎ গুরুগিরির তাড়না থেকে সে নিশ্চিন্ত।

সে এখন রপ্ত করতে শিখেছে, কেমন করে সানুনয় কণ্ঠে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। ভোজ কাজের নিদর্শন মাইক কেমন করে বাজে, ভোক্তার চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রসাদী ডাষ্টবিন নামক গহ্বর থেকে তাদের সমগোত্রীয় কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি বা সন্ধি স্থাপন করে খেতে হয় বা সুযোগ পেলে আগে ভাগে জেতার আনন্দে ও তাদের ঠকানোর আনন্দে বেকুবের মত হাসতে হয়।

সর্বাধিকারীর ন্যায় নামজাদা মানুষের সঙ্গে নরকের অপদার্থ শিশুর জন্মদিন পালন বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবে মানুষের মনের কথা কেউ বুঝতে পারে না, এই যা' সুবিধা!

জন্মদিন পালন ও নির্বাচনী আলোচনা সভাতে বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হলো। এক নজরে—সর্বাধিকারীর জয় যে অনিবার্য তাতে কারও নাকি বিন্দুমাত্র সন্দেহও রইলো না।

এরপর সমাধা হলো ভোজনপর্ব। তার পরেই ভুক্তাবশেষ সহ পাতাগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় ডাষ্টবিনে পড়তে লাগল ঝপঝপ করে।

শিশুর লালসা কাতর চোখের দৃষ্টি দেখে একটু ফাঁক পেয়ে তার মা যায় পরিবেশনকারীদের কাছে কিছু খাবার সংগ্রহের জন্য। ভোজপুরী দারোয়ানের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় না। ছুটে আসে লাঠি হাতে, 'নিকালো হিঁয়াসে—'

শিশু বায়না ধরে, 'চলো মা, আজকালকার কুকুরগুলো বড় পাজী, আগে ভাগে গিয়ে খেয়োখেয়ি করে, কিছুতেই আমাদের খেতে দেবে না। তাড়াতাড়ি চলো না!'

শিশুকে বুঝিয়ে বলতে পারে না মা, আজ তার জন্মদিনে সে তাকে কিছু খাবার উপহার দেবে।—মনে কি থাকে ছাই সে সব! তাদের আবার জন্মদিন!

মুকুল স্থির থাকতে পারে না আর ভিখারীদের অসভ্যতা দেখে। প্যাণ্ডেল থেকে বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দেয়, 'দূর করে দে জানোয়ারের দলটাকে—ওদের জ্বালাতে এঁদের মান-সম্মান রাখা দায় হলো দেখছি। সব এসে ভিড় জমিয়েছে খাই-খাই করে। হুঁ, যত অপদার্থ আর অপগণ্ডদের জ্বালাতে দেশটা ছেয়ে গেল, দেখছি।'

প্রধান অতিথি তখন চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। মুকুলের কথা শেষ হতেই তার কথায় সায় দেন, 'সাচ্চা বাত বলেছেন, সর্বাধিকারী—ওদের জন্যেই দেশটা উৎসন্নে যেতে বসেছে। আমার হাতে যদি 'পাওয়ার' থাকতো ওদের গুলি করে মারতে হুকুম দিতাম।

সভাপতি বলেন, 'শহর থেকে ভিখারীগুলোকে তাড়াবার কি কোন আইন নেই মুকুলবাবু? আগামী সিটিং-এ এ নিয়ে একটা আইন পাশ করানো যায় না?'

উপায়ান্তর বিহীন মা অদূরে দাঁড়িয়ে কাতর মনে ভাবে, সত্যই কি আমরা এ-পৃথিবীতে জন্মাবার মত জন্মেছি যে পৃথিবীর মানুষের অন্নে ভাগ বসাবো!

ছেলেটা মায়ের কাপড় ধরে টানাটানি করে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে মা, 'হতভাগার জন্মদিনে যদি প্রাণ

খুলে আশীর্বাদ করতে হয়, আমি প্রাণ খুলেই বলবো, আজ তোর মৃত্যুদিন পালনই আমার কাম্য—কিন্তু আমি মা হয়ে তা' বলতে পারব না—পারব না।'

দারোয়ান লাঠি নিয়ে ছুটে আসে।

ওরা তখন মান-অপমান, লাঠির আঘাত তুচ্ছ করে পেটের দায়ে ডাস্টবিনের পাশে কুকুরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। গাড়ীগুলো হর্ণ বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যায়। মাইকে বাজছে তখন—"সার্থক জনম আমার—"

সবার অজান্তে কিন্তু ঐ মাতৃ-হৃদয় কাঁদছে অন্তরের নিভৃত কক্ষে। তবে পেটের জ্বালায় শোক দুঃখ চাপা দিয়ে কুকুর আর সহধর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছাড়া উপায় কি তাদের? জন্ম থেকে এই তো করে আসছে তারা। ভিখারী জীবন কিভাবে কখন থেকে তার পর্বপুরুষেরা শুরু করেছে ভাবতেও পারে না। ভাবে, এই বুঝি তাদের পেশা। সমাজচ্যুত ছিন্নমূল মানব সমাজের কাছে কবে থেকে যে উল্কাপিণ্ডের মত এরা ছিটকে পড়েছে এবং কিভাবে ভিখারীর সৃষ্টি, সে আদিসূত্র আবিষ্কারও সহজসাধ্য নয়। অথচ দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। লালসা-কাতর মন কিন্তু ভিখারী জীবনকে মনে প্রাণে সমর্থন করে না। পারুল সর্বাধিকারীর মত সাজ পোশাক তাদের মনেও বার বার খোঁচা দেয় বটে, কিন্তু তা, পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—মানব-সমাজে মনুষ্যত্বের মহিমা জানাবার মত মনের পাঠশালা না খোলা পর্যন্ত।

॥ তেরো ॥

জানলাটা খুলে বাইরের দিকে একবার কি যেন দেখলে মুকুল। ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে প্রভাত হতে। অস্পষ্ট কুয়াশা নিবিড় ভাবে ভোরের আলোর টুঁটি টিপে ধরেছে। যেমন করে আজ 'এনফোর্সমেণ্ট' বিভাগ তার টুঁটি টিপে ধরবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার যেমন চিহ্ন থাকে না, তেমনি তার সে আনাগত বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ পরিষ্কার হয়ে আসে। সব নির্ভুল—ফাঁকিকে ফাঁকি দেবার ফন্দি ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ। আজকের অভিজাত জীবনে এই বুঝি পরমার্থ—ফাঁক আর ফাঁকি জানাই জীবনের মূলমন্ত্র। মনে মনে হাসলো সে—বিচিত্র ক্ষুরধার সে হাসি।

দেশলাইকাঠি জ্বেলে একটা চুরুট [illegible]ালে। বারকয়েক পায়চারি করলে পারুলের সমানে দিয়ে। ঘুম নেই চাখে, জড়িয়ে আসছে না চোখ দু'টো এত রাত জেগেও। জড়িয়ে আসছে বুঝি জিহ্বা আর পূর্বস্মৃতি। না-না, শেষ করতে হবে কথাগুলো, পারুলকে জানাতে হবে সব কথা। ভাল ভাবে বোঝে না, জানে না তাই তার বিপন্ন অবস্থাতেও ঘুমুবার আবেদন জানালে ছেলেমানুষের মত, জানতে চাইলে না তার উদ্বিগ্ন মনের অবস্থা। তার চোখে-মুখেও লক্ষ্য করা গেল না এতটুকু বিষণ্ণ ভাব। সে যেন তার কেউ নয়, শুধু সুখ-ভোগের সঙ্গিনী। কিন্তু কে তাকে দিয়েছে সে অধিকার? কে এ অতুল ঐশ্বর্যের ভোগলালসা বাড়িয়ে দিয়েছে? বিশেষ সুখ সংবাদে সে তাকে আনন্দ সহকারে দিয়েছে কত মূল্যবান পুরস্কার। তুচ্ছ দোষক্রুটি তো উপেক্ষা করে আসছে বহুদিন থেকেই।

গলগল করে একটা বোতল গলায় ঢেলে দিয়ে ঝালিয়ে নিলে গলাটা। মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। এতটুকু খাতির করে

তাকে কথা বলবে না। পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের জন্য চুপচাপ বসে পড়লো একটা চেয়ারে। তলিয়ে ভাবতে লাগলো মুকুল—বিগত দিনের কথা।

দুঃখে অধৈর্য হয়ে উঠেছে পারুল। তার নিদ্রাও ছুটে গেছে অনেকক্ষণ। যেন মুকুল তাকে চাবকে খাড়া রেখেছে। এমন ভাবে আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে এত কথা শুনতে হবে ভাবতে পারেনি কোনদিন। এখানে এসে থেকে শুধু পেয়েছে আবরণ আর আভরণ, সত্যকার শান্তি সুখ তেমন কিছু পায়নি বলেই বোধ হয়। তবু রামগোপাল তাকে 'মা' বলতে অজ্ঞান, সর্বদা রয়েছে তার স্নেহধারার একটা উন্মাদনা, তাতেই সে সবকিছু ভুলে আছে। কিন্তু আজকাল তা'ও যেন উবে যাবার উপক্রম। যা' সে শুনেছে রামগোপালের সম্বন্ধে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি ভেবে ভীষণ ভয় হয়।

পারুল কথাটা শোনবামাত্র মুকুলের কানে তুলতে দেরি করেনি। বড়লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। বলতে গিয়ে অপদস্থই হতে হয়েছিলো তাকে সেদিন, একটা কড়া ধমকও উপরি পাওনা হয়েছিলো তার।

'কি যা' তা' বাজে কথা বলছো পারুল? আমি বিশ্বাস করি না—তা'ছাড়া একথা যদি সত্যই হয়, উতলা হবার কোন কারণ নেই।'

'কি বলছো তুমি?—ছেলে কলেজ লাইফেই মদ শুরু করবে, সেই সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষে জীবনটা কলুষিত করবে আর তুমি-আমি তা' জেনেশুনেও ছেলেটাকে সংশোধনের চেষ্টা করব না?'

'না—সে গেঁয়ো জীবন যাপন পাড়াগাঁয়ে চলতে পারে, এখানে নয়। আমাদের মত স্ট্যাণ্ডার্ডের ঘরে ওরকম দু'একটা ছেলে বয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতি হয় না এমন—যদি কাজের করে নিতে পারা

যায়। ওকে আমি ঠিক কাজের করে নিচ্ছি দেখ না ?—তখন এমন নেশায় ধরবে, যে—'

'শোন—' আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় পারুল। 'আমাদের দু-চারটে নয়, একমাত্র ছেলে—তা'ও আবার—'

'থাক সে কথা—'

'কিন্তু তাকে যদি সময় থাকতে সাবধান না করো, ও শেষে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—'

'না পারে না। এত অতুল ঐশ্বর্য, বিরাট অট্টালিকা ফেলে বাছাধন কোথাও যেতে পারে না। তা' ছাড়া সে যেসব মহলে মেলামেশা করে, যা নিয়ে কারবার করে, তাতে অঢেল পয়সার দরকার। পাবে কোথায় ?'

ছেলেটা বুদ্ধিমান। এত অল্প বয়সে বি. কম. পাশের নজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধহয় খুব কমই আ[illegible]। উপযুক্ত জলসেচের ফলে ফসল বেড়েছে মনের আনন্দে ; কে [illegible] পিতামাতা, কোথায় তার জন্ম, সে-সবের তোয়াক্কা বা নীতির হিসাবে ধরা না দিয়ে। ছেলেটা ভাগ্যবান বই কি ! তা' না হলে সেদিন তার সামনে ও ভাবে হঠাৎ পড়বে কেন—অমন কত শিশুই তো পথে পড়ে থাকে। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে সে তাকে অনেকখানি নির্ভর করতে পারবে, ওসব সামান্য দোষত্রুটি নিয়ে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত করতে চায় না।

কিছুদিন আগের কথা। রামগোপালের কলেজ লাইফের বিশিষ্ট বান্ধবী লীনার বাবা হঠাৎ একদিন তাকে টেলিফোন করেন, তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রামগোপালের বিয়ে দিতে আগ্রহী। সম্মতি পেলে পাকা কথাবার্তা বলে সামনের ফাল্গুনে বিয়ে দেবেন।

মেয়েটির সঙ্গে রামগোপালের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতো মুকুল। একবার পারুল মারফত তার মতটা জেনে নিয়ে ছেলের পছন্দমত মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিলেন ধূমধাম সহকারে।

লীনা বুদ্ধিমতী। স্বামীর দোষত্রুটি সংশোধন করতে চাইলে গোপনে কত সাধ্যসাধনা করে। রামগোপাল একগুঁয়ে। কোন কথা শুনতে চাইলে না লীনার। শেষে কথাটা তার মা-বাবার কানে গেল। ব্যারিস্টার সাহেব বেহাইয়ের সম্মতি নিয়ে একটা মিথ্যে 'ডিভোর্স কেস' শুরু করে দিলেন অনন্যোপায় হয়ে।

প্রথমটা না-না করেছিলো মুকুল। শেষে বেহাইয়ের পরামর্শ না মেনে উপায় ছিল না। 'দেখুন, আপনি বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক, আপনার জীবদ্দশায় সে সব তছনছ না হতে পারে কিন্তু আপনার অবর্তমানে বাবাজী যথেচ্ছাচারিতার ফলে হয়তো একদিন পথের ভিখারীও হতে পারে। তখন? বরং সময় থাকতে সাবধান…… অবশ্য সবই আপনার মতামতের ওপর নির্ভর করে। কেউ জানবে না, এটা মিথ্যা 'কেস'। যদিও জানি, আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন তাকে সংশোধন করবার কিন্তু কতটুকু সে শুধরেছে? আমার একমাত্র মেয়ে, বে[illegible]শাই তার প্রাণে কোন ব্যথা আমরা সইতে পারব না। যদিও আমি আইনজীবী তথাপি 'ডিভোর্স কেস' করে মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ প্রাণ থাকতে দিতে পারব না। না-না, এ আইন—কেন জানি না, আমার মনঃপূত নয়। সে আমার ধাতে সইবে না। তা' ছাড়া আপনি আর একটা দিক ভাবুন, আপনার শুধু ব্যবসা নয়, রাজনীতিতেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এই ধরুন না সভা-সমিতি লেগেই রয়েছে মাঝে মাঝে, তারপর লোকসভার অধিবেশনে বেশ কটা দিন ব্যয় হচ্ছে— তাতে আপনার ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছে কিনা? কিন্তু বাবাজী যদি এ দিকটায় ভাল নজর দেয়, আপনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, তা ছাড়া আপনারও ত বয়েস হচ্ছে, ছোট থেকে নাকি অমানুষিক পরিশ্রম করে আসছেন—শরীর বলেও ত একটা কথা আছে।

পারুল কাছে বসেছিলো। সব শুনে একটা উত্তর দেবার জন্যে

উসখুস করছিলো অনেকক্ষণ থেকে, তবে মুকুলের মুখে কোন উত্তর না শুনে কিছু বলতে পারছিলো না। সে সর্বান্তঃকরণে বেহাইয়ের কথা সমর্থন করে। তাই উচিত। তার বাবা কতটুকু ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ রাখে? বাড়ীতে ঘুমুবার সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়টা তো বাইরে বাইরে কাটে তার। বাড়ী ফিরতে এক একদিন রাত বারটা-একটা বেজে যায়।

খাবার দিতে গিয়ে পারুল কতদিন ছেলের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছে। এক-একদিন না খেয়েই শুয়ে পড়েছে শরীর ভাল নেই অজুহাত দেখিয়ে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে, কেন সে খেলে না, কেন অত রাত করে বাড়ী ফেরে। বলেও ফেলেছিলো একদিন সহ্য করতে না পেরে, 'গোপাল তুই মদ খাস'?

ভীষণ চালাক রামগোপাল। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আজ কিছুতেই বন্ধুরা ছাড়লে না, মা। তাই এক গেলাস—'

'ওসব খেতে নেই, অ[illegible]কখনো খেও না, বাবা! কেমন'?

'না—আর কিছুতেই নয়'!

গোপাল কথা শোনেনি পারুলের। আবার খেয়েছে কতদিন। বার বার সে বন্ধুদের মাথায় সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে অম্লান বদনে। শেষে পারুল ওরকম প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে মিশতে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে।

গোপাল জিভ কেটেছে সলজ্জভাবে, 'কি বলছো মা? বন্ধুরা কি আমার যে সে ঘরের ছেলে? সব আমাদের মত ঘরের, কেউ কেউ আরও বড় ঘরের! ব্যারিস্টার উমেশ ভট্‌চায্যির নাম শুনেছো? তাঁর মেয়ে লীনা, বড় ভাল মেয়ে। মদ খায় না বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে তার সম্ভ্রমে এতটুকু বাধে না। তারপর বিশ্বাস আইরন ফ্যাক্টরীর মালিক ত্রিদিববাবুর মেয়ে দোলনচাঁপা, সে তো একদিন ক্লাবে না গেলেই কৈফিয়ত চাইবে—

না-না ওদের সঙ্গ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারব না।—এসব কি বলছো, মা' ।

হাতের বাইরে ছেলে চলে গেছে। তাকে আর গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয় তাই স্বামীকে এসব কথা জানিয়েছিলো পারুল। সে সময় সংশোধনের চেষ্টা করলে হয়তো ছেলেটা এতখানা বাড়াবাড়ি করতো না। আজকাল তো সবদিন বাড়ীই ফেরে না। সকালে উঠেই নগদ পঁচিশ টাকা হাত খরচ আর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সকালের দিকে ঘণ্টা তিনেক ব্যবসা দেখে তারপর খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায়, কেন যায়, কখন বাড়ী ফেরে সে কথা নাকি জানে না মুকুল। তাই সুবোধ বালকই মনে করে ছেলেকে। কিছুদিন আগে বাড়াবাড়ির কথা শুনে কেবলমাত্র গোপালকে ডেকে বলেছিলো, 'গোপাল, এমন কোন কাজ করবে না তুমি, যাতে আমার মানমর্যাদায় আঘাত পায়।'

গোপাল নতমুখে বলেছিলো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সেরকম কোন কাজ করবো না, বাবা।'

'আমি নিশ্চিন্ত তবে মাঝে মাঝে কথাটা কানে আসে কিনা।'

'বাজে কথা, আপনি বিশ্বাস করবেন না।' গোপাল বেরিয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে মিথ্যে কথা বলে। একটুও দুঃখ পায়নি—এ বুঝি তাদের মত ঘরের ছেলেদের একটা সাধারণ নেশা। এ না হলে বের হবে কি করে ঘরের বাইরে? বন্ধুরাই-বা তাকে পিঠ চাপড়ে সাবাস দেবে কেন? মোসাহেবের দল ঘিরে থাকবেই বা কোন উল্লাসে?

পারুলের দিকে চেয়ে এবার মুকুল বলে, 'তুমি কি বলো? বেহাই মশাই যা' বললেন, তা' করা কি ঠিক হচ্ছে?—গোপালকে বরং আর একবার বুঝিয়ে বললে হতো না'?

'গোপাল তোমার নাগালের বাইরে। বেহাই মশাই যা'

বললেন, তা' করলে বরং ছেলেটার পরকাল ভাল হবে। তা' ছাড়া যা' করা হচ্ছে, সে তো নকল—যদি এরকম ব্যাপার দেখে সে লজ্জিত হয়, তখন না হয়—'

বুকের কাছে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করে মুকুল। 'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছো, নকল—নকল 'কেস'! মুকুল সর্বাধিকারী এ-জগতে নকলের কারবারে সিদ্ধহস্ত, সব নকল—নকলে নিকষকুলীন হয়ে গেছে! তাই করুন বেহাই মশাই, সেই ভাল। সব দিক ভেবেচিন্তে যা' ভাল হয় করুন, আমি এ নিয়ে আর ভাবতে পারছি না। কাল সকালেই দিল্লী যেতে হবে, তারপর আমার অনেক কাজ—আমার সব নকলকে আসলে পরিণত করতে হবে! প্রমাণ করতে হবে, আমার সব কিছু নকল হতে পারে কিন্তু আমার হিসেব-নিকেশ লেনদেন আসল সাজে সজ্জিত। অঙ্কে এতটুকু খুঁত নেই, অর্থাৎ ধুলো দিতে হবে, এনফোর্সমে[illegible]ভাগের কর্তাদের চোখে।'

'হুঁ, এও এক মস্ত বড় ঝামেলা!'

অট্টহাসি হেসে মুকুল বলেন, 'কিন্তু তারা জানে না, আমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করতে করতে নিজে ধূলিসাৎ হয়ে যাবো তবু ধরা দেবো না। না—না এ অহঙ্কারের কথা নয়, আমাকে ধরা সোজা কথা নয়। ধরলে ধরা পড়তাম বহু আগেই।'

বেহাইয়ের সম্মতি নিয়ে চলে যান উমেশবাবু।

॥ চৌদ্দ ॥

লোকসভা অধিবেশনে গিয়ে শান্তি পায় না মুকুল। ভারত সরকার ব্ল্যাক-মানি উদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে। দেশের ব্যবসায়ী, ধনী সম্প্রদায় টলটলায়মান। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কিভাবে যক্ষের মত সে ধন বেঁধে রাখা যায় সে উপায় খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি করেন আইনজ্ঞদের কাছে। নিজেদের কৌশল চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস হয় না। বেশ ক'জন বড় বড় ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেছেন।

অধিবেশন শেষে বিষণ্ণ মনে কলকাতায় ফেরে মুকুল। দুঃসংবাদের একটা কিনারা করা চাই। এনফোর্সমেন্ট তো লেগেই রয়েছে পেছনে।

তিন মাস পর আজ রাতে সব কিছু হিসাব নিকাশ তাঁর মতে নির্ভুল এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হলো। কিন্তু যাকে সে স্ত্রী বলে সেদিন বালীগঞ্জের লেকে গ্রহণ করেছে, সে আজ এতবড় বিপদের কথা জেনেও নির্বাক। জানে না সে যদি তাকে ধরতে পারে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, বেশ কিছুদিন জেলে পচে মরতে হবে। তার সমগ্র বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করেও ছাড়ানো যাবে না। সরকারের কঠোর মনোভাব। জনসাধারণের দুঃখকষ্ট ঘোচাতে বদ্ধপরিকর। মুষ্টিমেয়র হাতে অতুল ঐশ্বর্যের দ্বারা কোন সুফল হয় না। তাতে দেশের উন্নতির পথে যে বিরাট অন্তরায় তা' আজ কে না জানে? প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুলতেই দু-চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারে মুকুল, সেও তো সেরকম দুর্নীতির অভিযোগে যে-কোন মুহূর্তে অভিযুক্ত হতে পারে, তখন?

দেশের মানুষ আজ ক্ষুধার অন্ন, রোগে ওষুধ, পরনের বস্ত্র, শিক্ষা চায়। তারা মানুষ হতে চায়: এসব যদি না মেলে প্রয়োজনমত, স্বাধীনতার অর্থ কি? স্বাধীন চিন্তাধারার অবসর কোথায়? জ্ঞান-বিজ্ঞান কিভাবে প্রস্ফুটিত হবে এসবের জ্বালায় অহরহ জ্বললে? কিন্তু যারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তাদের অখাদ্য-কুখাদ্য, কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে মুনাফা লুটছে সমাজের নিম্ন-মধ্যস্তর থেকে তারা কি তাদের অতি লাভের লালসার স্বার্থে এদের জীবন ধারণের মান নিম্নস্তরে পেঁাছে দেবার জন্য দায়ী নয়?

মানুষের মত বাঁচতে চায় জনগণ। ভবিতব্যের নামে অপবাদ দিতে নারাজ, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে তারা আজ জাগ্রত। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আজ প্রয়োজন, পরলোভী রাজ্যের লেলিহান শিখার মোকাবিলা এই সাধারণ মানুষই করবে, সুতরাং দে[illegible] অভ্যন্তরে তাদের দাবি না মিটালে হীনবল হয়ে পড়বে [illegible]—দেশোন্নয়নে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায় মানুষ। বিস্বাদে ভরে গেছে তাদের মন। এতদিন অদৃষ্ট বলে মেনে এসেছে সব কিছু নির্বিবাদে। অথচ এখনও অধিকাংশ লোক, যারা মরতে বসেছে তারাই ভেবে মরে এটা পাপ ওটা পুণ্য। না খেয়ে শুকাবে কই মাছের মত, তবু নির্জীবের মত—ক্লীবের মত ঘুমাবে অদৃষ্ট আর পরকালের দোহাই মেনে। ভবিষ্যতে ভাল হবে, পরকালে সুখী হবে—এসব বদ্ধমূল ধারণায়। বর্তমান রইলো যার নির্জীব, ভবিষ্যৎ হবে প্রাণবন্ত! অদ্ভুত ধারণা! মনের নিষ্ক্রিয় বিস্ময়কর মাপকাঠি। না খেয়ে এরা ধনীদের খয়রাত দিচ্ছে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে!

জনগণের মনে আজ তাই স্বতঃই উদিত হয় কিসে আমাদের কল্যাণ!

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। শান্তিই কাম্য তাদের। অসাধু ব্যবসায়ী, গোপন কারবারের ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাই আজ দেশের মানুষের অতি সাধারণ বিদ্রোহ। তারা বাঁচতে চায় বাঁচার মত। টাকা কাল নয়—টাকার রং লাল। পয়সা থেকে টাকা—সব লাল। ধনীর সিন্দুকে জমে তাজা রক্ত আর লাল নেই, জমে বিবর্ণ হয়ে গেছে লজ্জায়! লক্ষ্মী আজ বর্ণহারা!

সরবে চীৎকার করে ওঠে [illegible]। 'টাকার রং লাল—কাল নয় —লাল—লাল—লাল—'

ভয় পেয়ে যায় পারুল। ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চায়। কথা বলতে পারে না। বলবে কি, তাকে যেভাবে আজ অপমান করতে আরম্ভ করেছে, প্রত্যুত্তর করলেই ত রীতিমত একটা দক্ষযজ্ঞ বেধে যাবে।

'টাকা কাল নয়—লাল। আমি বলছি, লাল। তাজা রক্ত জমে কাল হয়ে গেছে মুষ্টিমেয়র অবৈধ আওতায় এসে।'

পারুল উঠে দাঁড়ায়। ফের তাকায় মুকুলের দিকে। সে ভয়ার্ত দৃষ্টি তাকে রীতিমত বিচলিত করে। তবু সাহস সঞ্চয় করে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, 'তুমি এভাবে চীৎকার করছো কেন, গো?'

'কেন চীৎকার করছি, সে তুমি বুঝবে না। না-না, সে বোধশক্তি তোমার নেই। আমি আজ প্রচুর টাকার মালিক হয়েছি বটে, কিন্তু এতদিনে জানতে পেরেছি টাকার রং কালো নয়, লাল—জবাফুলের মত টকটকে লাল। গরীবের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে উপার্জন

—সরকার গঠনমূলক কাজে যে পয়সা খরচ করেন, তা' ধনীর অট্টালিকা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের জন্য নয়, দরিদ্রের দারিদ্র ঘুচানো তথা সম্পদ বাড়াবার জন্যই সে পরিকল্পনা। কিন্তু আমরাই সে টাকার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করে, ন্যায্য অধিকারীর অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়ে বিলাস ব্যসনে মত্ত হই। যে সব জিনিস গড়ে তুলি তা' অতি মুনাফার জন্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র অজস্র টাকা ঋণ করে আনা হচ্ছে দেশকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে, কিন্তু মাঝখানে এই লালসাকাতর ধনী সম্প্রদায় শুধু লাভের অংশ নয়, অতি লাভের লালসায় প্রচণ্ড অন্তরায়। খাদ্যে ভেজাল দিই, খাদ্যদ্রব্য মজুত রেখে ছিনিমিনি খেলি অথচ যারা ফসল ফলায় তারাই দুঃসময়ে খাদ্যের জন্য আমাদের দরজায় এসে মাথা কোটে। —নির্মম পাষাণ আমরা, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে।'

॥ পনেরো ॥

একটু থেমে মুকুল বলতে শুরু করে, 'তুমি তো জানো আমার দারিদ্রের কথা ; সবদিন পেট পুরে খেতেও পাইনি আমরা। বিশেষ ভাবে মনে ধাক্কা দেয়, দিদির বিয়ে নিয়ে। তোমার মনে আছে বোধহয় বাবার দারিদ্রের জন্য দিদির বিয়ে হয়েছিলো অপাত্রে। দিদি জীবনে সুখী হয়নি। কিন্তু কেন ? তার রূপ-গুণ দুইই ছিল, ছিল না বাপের অর্থ, তাই তাকে বাধ্য হয়ে বাপের অন্তরের অনিচ্ছা থাকলেও সাধ্যের সীমা বুঝে সে প্রৌঢ়কেই স্বামীরূপে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।'

বেদনার্ত কণ্ঠে মুকুল বলে চলে, 'আমার দিদির ফরসা রং। শান্ত-সুশ্রী-নিটোল গড়ন—সৌন্দর্যের দেবতা যেন অকৃপণ হস্তে রংয়ের তুলি বুলিয়ে দিয়েছিলে[illegible]দির সর্ব অবয়বে। আহা কি চোখ! কি ভ্রূ! কি সুকোমল চারু কপালখানি। আর অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশ—তার বুঝি সত্যই তুলনা নেই। ভিখারী বাপের ঘরে ইন্দ্রাণীর দেহৈশ্বর্য নিয়ে জন্মেছিলো দিদি।

বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ তাঁর। চেহারা-খানা অতি কর্কশ। উঁচু উঁচু দাঁত। বসা বসা গাল।—কপালের বলিরেখাগুলো সুস্পষ্ট।

এই বর ?

বর এসে পড়েছে শুনে শাঁখে ফুঁ দিতে দিতে ছুটে গেলাম। বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রঙীন কল্পনায় বিভোর তখন আমি। না জানি, জামাইবাবু কেমন রঙ-ঢঙের হবেন।

এয়োরা হুলুধ্বনি দিয়ে বর বরণ করে নিচ্ছে। মুঠো মুঠো খই ছিটোচ্ছে পালকির ওপর। কে কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে।

কিন্তু আমার বুকে তখন কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটোচ্ছে।

হাতের শাঁখ হাতেই রইলো ; বাজাতে পারলাম না। এই আমাদের জামাইবাবু ? দিদির বর ? একটা আধবুড়ো লোক, আমাদের পাড়ার হরি ঘটকের মত চেহারা, দিদির লক্ষ্মীপ্রতিমার মত চেহারা ওঁর পাশে মানাবে কি ? অনেক বিয়ে দেখেছি কিন্তু সাধারণতঃ এরকম বয়সের বর ত দেখিনি ! দিদি ত বরকে দেখেনি, দেখলে পছন্দ হবে ? আজ তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে বসে বসে কাঁদবে না ত ? ওঃ—বাবার কি কোন আক্কেল নেই ? মা কি কানেও শোনেন নি কথাটা ?

একরাশ প্রশ্ন মনের মধ্যে এসে জমা হলো। কিন্তু কাকে এ প্রশ্নের জবাব চাইব ?

শাঁখ হাতেই ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মা তখন খুব ব্যস্ত। এক সময় মাকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা—জামাইবাবু বুড়ো কেন' ?

মা একটু হেসে বললেন, 'বু[illegible]লতে নেই বাবা। শুনতে পেলে তোমার দিদি দুঃখ করবে, জামাইবাবু রাগ করবেন' !

'তবে ঘটক মশাইয়ের মত চেহারা ওলোকটার সঙ্গে দিদির বিয়ে দিচ্ছো কেন' ?

মা বোধহয় সব কথা জানতেন, তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বুড়ো কেন হবে ? ও তোর মনে হচ্ছে। কত বিষয়সম্পত্তি ওঁদের জানিস ?—তোর দিদি কত সুখে যে পড়ল এবার।'

বুঝলাম, মা আমার আসল কথার জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। কি জানি, কেমন করে আমার সে শিশুমন অসন্তোষে ভরে উঠলো। বিয়ে দেখতে প্রবৃত্তি হল না। রাতে কিছু খেলামও না। ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো দিদির ডাকাডাকিতে। ভোর বেলায়। দিদি তখন বধূর সাজে। মানিয়েছে চমৎকার ! একি ! দিদির গায়ে এক-গা গহনা উঠলো কখন ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

দিদির রূপ যেন আরও ঝলমল করে উঠেছে। পরনে বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ, তাতে উগ্র সেন্টের গন্ধ আর মুখখানা স্নো-পাউডারে লাঞ্ছিত হয়ে কত সুশ্রী না হয়ে উঠেছে! সর্বোপরি সিঁদুরে দিদির মুখখানা হয়ে উঠেছে সর্ব সৌন্দর্য বিভূষিতা।

'আয়, উঠে আয়—মা বললেন কিছু খাসনি? ইশ পেটটা একবারে খালি—ওঠ্—ওঠ্—' দিদি হাত ধরে টেনে তুললে বিছনা থেকে।

চোখ কচলাতে কচলাতে নীচে নেমে এলাম। দিদি বোধহয় কৌতুহলবশতঃ বাসর ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমিও।

দিদির বান্ধবীরা এবং ঠাকুমা সম্পর্কিতা ক'জন প্রতিবেশী তখন জামাইবাবুকে ঘিরে ধরেছেন। কে কি বলছিলো জানি না কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটা কথা মনে আছে।

'একটা গান গাওনা হে জামাইবাবু?'

'গান যে জানি না —'

'গাইবে কেমন করে ভাই—গানের বয়স কবে পার হয়ে গেছে, এখন হরিনামের পালা'।

'না-না কোন কথা শুনবো না, অন্ততঃ একখানা গাইতেই হবে।'

'মাপ করবেন—'

ও-মা গান জানে না, এ কেমন জামাই গো!—যেমন জান গাও না হে—দু-চার কলি।'

কে যেন ফস করে বলে উঠলো, 'তোবড়ানো গালে গান জমলে তো'! বাকী সবাই 'হো-হো' শব্দে হেসে উঠলো।

দিদি নির্বাক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তখন। অমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দিদি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে আর দেখলাম হ্যাজাকের আলোতে—তার দু-চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে।

মা আমাকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে থাকলেন…

খেতে তেমন স্বাদ পেলাম না। সামান্য কিছু খেয়ে ফের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার দিদির সে রূপ আর দেখিনি। বিয়ের পর কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাতো। তার সে বন্ধন-ক্লিষ্ট আত্মার কান্না যেন আমি শুনতে পেতাম।

পরে শুনেছিলাম দিদির রূপে মুগ্ধ হয়েই জামাইবাবু দিদিকে বিনা পণে বিয়ে করেছিলেন। তা' না হলে তাঁর মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে জামাতারূপে পেতে বাবার সর্বস্ব বিক্রি করেও সম্ভব হতো না। জামাইবাবু তাঁর প্রথম স্ত্রীর সব অলঙ্কার দিদিকে উপহার দিয়েছিলেন।—বলতে লজ্জা নেই, বিয়ের খরচ-খরচা বাবদ বাবাকেও কিছু নগদ টাকা দিয়েছিলেন গোপনে।

আজ আমার মনে হয়, দিদি জীবনে সুখী হতে পারে নি। দিদির মুখেই শুনেছিলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকারের নেশা আছে, জামাইবাবু তা' থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অষ্ট[illegible]র মাতাল হয়েই থাকতেন। দিদিকে অবশ্য বেশীদিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। জামাই-বাবুর মৃত্যুর তিন বছর পর দিদি কলেরায় মারা যায়।

মাঝে মাঝে চোখ ফেটে জল আসে আমার। মনে হয় কাঞ্চন-কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে জগতে যে-কোন বস্তুর মূল্য যাচাই হতে পারে, কিন্তু একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পাশে কামনা-বাসনা মুখরা নবীনা যুবতীর জীবন-যৌবন বলি দেওয়া সমাজের এক নিষ্ঠুর শাস্তি ছাড়া কিছু নয়। আর তা' আমার মনে ভীষণ আঘাত দেয় বলেই তোমাকে সেদিন বালীগঞ্জ লেক থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—বিয়ে করার কথা ভাবিনি।

পরে আরও শুনেছিলাম, জামাইবাবু সব রাতে বাড়ীতে শয্যাশ্রয়ী হতেন না। বৈঠকখানায় মাতাল হয়ে গড়াগড়ি যেতেন। মাঝে মাঝে কলকাতা-লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়ে দিনের পর দিন নাচ-গান শুনে বিভোর হয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর বন্ধুরা

শাঁসালো বন্ধুকে নিত্য নতুন নেশায় তন্ময় করে রাখতেন—দেহ ও মনের খোরাক জোটাতেন অদ্ভুত উপায়ে।

দিদি বলতো, 'বড়লোকের ঘর কিনা, এসব দোষ ধনী আর আভিজাত্যের নামে খণ্ডিত হয়।'

—'জামাইবাবু কি ভাল হবেন না, দিদি?'

ম্লান হেসে দিদি বলতো, 'আমার সতীন বিশ-বাইশ বছর ধরে ওঁর হাতে পায়ে ধরেও মতিগতি বদলাতে পারেন নি বলে শুনি, শেষে নাকি বিষ খেয়ে তিনি মনের যন্ত্রণা লাঘব করেছেন—আমি ত কোন্ ছার'।

আমি শিউরে উঠতাম, দিদি যদি তার সতীনের মত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে! বলতাম, 'আমাদের গ্রামের জাগ্রত দেবী, কালী-নারায়ণ মেরাই-চণ্ডীর পূজা করিয়ে পুষ্প-কবচ পাঠিয়ে দেবো, দেখবে জামাইবাবু ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।'

দিদি শুষ্ক হাসি হাসতো, ভাবতো—এ বুঝি বিধাতারও অসাধ্য!

আমি তখন কিশোর, তাই দিদি আমাকে সব কথা বলতো না। জামাইবাবুর মৃত্যুর পর যখন গেলাম, তখন দিদি সব কথা খুলে বললে, জামাইবাবু নাকি অনেকদিন ধরে এক কঠিন ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে ওঠে, ডাক্তার-রোজা-বদ্যিরা হার মানতে বাধ্য হয়। যেহেতু সামান্য একটু সুস্থ হলেই ফের অনিয়ম অত্যাচার করতেন। শেষে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য এ গোপন কথা। যেহেতু জামাইবাবুকে এজন্য মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। 'হার্টফেল' করেছেন বলে খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

॥ ষোল ॥

তাই বলছিলাম পারুল, টাকার রঙ লাল,—কাল নয়। যে টাকাটা তৈরী হয় সেটা রক্তের বিনিময়েই তখন টাঁকশালে তৈরী হচ্ছে—বিলিয়ে দেওয়া বা অন্যায়ভাবে সিন্দুকে জমাবার জন্য নয়। রীতিমত তার মূল্যায়ন স্থির করেই এ পরিকল্পনা। তা' যদি না হবে—মানুষের জীবনের সঙ্গে টাকার মূল্যায়ন হবে কেন? কেন অর্থ ছাড়া বিয়ে হয় না? অর্থাভাবে আমার দিদিকে জীবনের একটা অপরিহার্য পরিচ্ছেদ থেকে বঞ্চিত হতেই-বা হলো কেন?

দিদি কোনদিন সুখী হতে পারেনি। আমরাও। পরে এ নিয়ে মা-বাবা দুজনকেই আক্ষেপ করতে শুনেছি। কিন্তু আমরা হিন্দু। বংশগৌরব, সমাজ, কৌলীন্য—এসব মানতে হবে তো!—তাই সেকথা ভেবে মাঝে মাঝে হৃদয়ের অতল-সাগরে তলিয়ে যাই। এ আমার মনগড়া দুঃখ নয় সত্যকার মর্মভেদী বেদনা—যা' অতি সত্য। কি আর বলবো সেদিনের কথা পারুল—আমি জানি দরিদ্রের ঘরে সব কিছুর দীনতা সুস্পষ্ট। আমি দেখেছি, সে সময় কতজনকে ভাল কথা বলতে গিয়েও হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে, কত সৎ কামনা-বাসনা দলে-পিশে শেষ করে দিতে হয়েছে। কত অন্যায়-অবিচার নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। যদিও মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—দারিদ্র্য টুঁটি টিপে ধরেছে—সাবধান!

সহসা পারুল বলে,—'মনে আছে, একদিন বলেছিলাম, আসল সত্য অর্থ নয়, দেখছি আজ তুমি তা' বুঝতে পেরেছো!'

—'বুঝেছি মানে? আমার দেহের কঙ্কালটাও পর্যন্ত টের পেয়েছে যে আসল সত্য অর্থ নয়। টাকা—সে তো লাল, ঘোর রক্তবর্ণ!'

পারুল অনুনয় কণ্ঠে বলে, 'তুমি থামবে ?'

মুকুল তার কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে চলে, 'আজ অতীতের কথা বার বার মনে আসছে। ভুলতে পারছি না অতীত, অতীত যেন আমার প্রিয় বন্ধু! অতীতের সে নয়নাশ্রু, প্রাণটাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। আকাশে বাতাসে আজ বাসুকির নিঃশ্বাস, সে বিষাক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস আজ দূরীভূত করার প্রয়োজন। কাঁদছে দেশের ঘরে ঘরে কত মানুষ অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসার জন্য, আর আমরা তাদের নয়নজল দেখেও উপেক্ষা করে দিব্যি আরামে উপর-তলার মানুষ হয়ে তাদের ব্যঙ্গ করছি। শুনেছি নয়নজলে পাষাণ গলে, কিন্তু মানুষের হৃদয় কি পাষাণের চেয়েও শক্ত। এও শিখলাম, অর্থ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। আসল শান্তি মনের নিভৃত কক্ষে নিদ্রিত—তাকে জাগ্রত করতে হলে মনটাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে প্রেমের মিশাল দিতে হবে। ফাঁক আর ফাঁকির উন্মাদনায় ছুটেছিলাম। আজ অনুশোচনায় মন-প্রাণ ভরে উঠেছে। ভাবছি, আজ আমি কোথায়? কোন্ প্রচণ্ড ধাক্কা আজ মনের শত শত দ্বার হৃদয়কে খুলে জাগ্রত করে দিলে ?'

সহসা নরম হয়ে পড়ে মুকুল। 'পারুল, আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি !'

—'অত চীৎকার করো না গো—পাগল হয়ে যাবে! শুনছো ?' ফাঁক পেয়ে ব্যথাতুর কণ্ঠে পারুল বলে।

—'হতে পারি! তবু আমার প্রাণের সে সজল ব্যথাভরা ঘটনাগুলো তোমাকে না বলে থামতে পারছি না—যা সত্য, একবিন্দু ভেজাল নেই যাতে। সত্যি বলছি পারুল, তুমি বিশ্বাস করো, যা তোমাকে এতক্ষণ ধরে বললাম, তাতে ভেজাল নেই এতটুকু, তবু যেন সব বলা হলো না, বলতে পারছি না গুছিয়ে।—জীবনটা গোঁজামিলে ভর্তি যে আমার! জীবনে পেয়েছি বহু দুঃখ ; সুখ-

ভোগও কম করিনি, কিন্তু অনুশোচনা এক্ষণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

—'তুমি থামবে ?'

—'থামতে বলো না, থামতে পারছিনে, পারুল। ভেতরটা আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একদিন বুক ফুলিয়ে কালোবাজারী করেছি, আজ ধরা পড়বার মুখে অন্তর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে।'

পারুল এবার মুকুলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে, 'ওগো সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি সব জেনে শুনেও কেন তোমার বিপদে সহানুভূতি জানাতে পারছি না। আমার বড় ভয় করে, যদি দুর্বলতাবশতঃ তোমাকে আমার কাল্পনিক ভয় প্রকাশ করে ফেলি—তুমিও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি কি করবো তখন ? আমায় তুমি মাফ করো, হালভাঙা, পালছেঁড়া নৌকার মত আমার এ প্রাণটা আর ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ছেড়ে দিও না। ভরাডুবির ভাবনা ভাবি না, ভাবি কেবল তোমার কথা। যে ইচ্ছা করলে, আমার চেয়ে দু-পাঁচটা রূপসী স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতো, সে কেন আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে! হও তুমি নকল কারবারী, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তুমি আমার কাছে আসল সোনার মত,—একটি কারণে, তা' হলো তুমি মহান, তোমার মহত্ত্ব আমার মত হতভাগিনীকে ছায়ার মত সুশীতল করে তুলেছিলো সেদিন—যেদিন আমি ভাসছি চোখের জলে, পুড়ছি মনের অনলে।'

—'তবু বলছি পারুল, টাকার রং লাল, যতই যা'করি—এ ধারণা আজ আমার মনে দৃঢ় হয়েছে। টাটকা সতেজ রক্তিম বর্ণ সে টাকার। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, জীবিকার জন্যই জীবনটাকে কলঙ্কিত করেছি। অথচ আমার বাবা শত দুঃখকষ্টেও মিথ্যা আচরণ করেন নি। উপবাস করেছেন কতদিন, তবু ভিক্ষা চাননি কারো কাছে। আর আমি এমন মোহে ডুবলাম যে, কলঙ্কিত করে তুললাম বংশধারাকে!'

—'তোমার হিসেব মিলেছে ?'

—'হ্যাঁ, তবে নিদারুণ পরিশ্রম করে যে হিসেব খাড়া করেছি, তা' থেকে আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে টাকার রং লাল—গরীবের অর্থ আত্মসাৎ করেই আমার এ অট্টালিকা, বিলাস-ব্যসন সবকিছু।'

—'তুমি শান্ত হও !'

—'শান্ত নয়, সমাধিস্থ হয়ে থাকবার দিন ঘনিয়ে এসেছে আমার—চিরশান্তিরও বড় প্রয়োজন আমার !'

"কিন্তু কোথায় শান্তি ?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি নেই পারুল। এইতো বছরখানেক আগে ক'দিনের জন্যে গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, যা' শুনলাম—অবাক হয়ে গেলাম। কষ্টই হলো দেখে শুনে।—অদ্ভূত আচরণ মানুষের। সেখানেও যেন চলেছে আইন আর রাজনীতির খেলা—মনুষ্যত্ব নষ্ট করবার বিরাট ষড়যন্ত্র। যদিও একথা ঠিক আমার মুখে মানায় না।

আজ আমার মনে হয়, ফেলে আসছি এক-একটা দিন আর যেন অনাবিষ্কৃত জগতের পরিচয় পাচ্ছি। আমার সীমিত ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে নিত্য দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে যেমন নিত্য নতুন বিষয়, তেমনি অতীতের ঘটনাগুলো আরও মর্মান্তিক সুন্দর হয়ে স্মৃতি-চারণে সহায়তা করে ফেলে-আসা যে এক জগতের দৃশ্যপট চোখের সামনে উপস্থাপিত করে একটা ঝঙ্কার তুলছে। জীবনযন্ত্রণায় ডুবে থেকে এ এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির অনুভূতি। এ যেন মনের অচিন্তনীয় উন্মোচন। দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ এক অখণ্ড প্রবহমাণ প্রাণস্রোত যেন বারবার আমাকে অতীতের দিকে টানে। কত কোটি কোটি মানুষ উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলে উঠে কত ঘটনার ওপর ছেদ টেনে কবে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে অতীতের অন্ধকারে। সে দিনগুলো আর নেই, আমার মনে একটা রোখাপাত ছাড়া তাদের অস্তিত্ব আর কেউ স্বীকার করবে না ; তবু আজ যেন আমি নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতিয়েছি অতীতের সঙ্গে। যদিও তার রূপ-অর্থ বদ্‌লে গেছে তবু তার দ্যুতির স্বরূপকে চিনতে ভুল হয় না আমার—বিশ্লেষণ ও মাধুর্যে আজ এ বিক্ষিপ্ত জীবনে বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করি। নতুন করে আবিষ্কারের প্রেরণায় চিত্ত

আমার ভরপুর হয়ে ওঠে—সুখে দুখে ; মনে হচ্ছে হয়ত বা এ আমার মনের সংশোধিত নূতন সংস্করণ।”

পারুল উৎসুক হয়ে বলে, ‘কি দেখলে শুনলে বলবে তো ? নতুনত্ব কি আছে তার মধ্যে ?’

গ্রামে ঢুকতেই দেখলাম, সংস্কার অভাবে চৌধুরীদের শিব মন্দিরটা সুখে রোদ পোহাচ্ছে। ভর্তি দুপুরে সূর্যদেব মন্দিরের চূড়া ভেদ করে শিবলিঙ্গটাকে ঝলসে দিচ্ছে, এদিকে বর্ষার ক-মাস বরুণদেব খুশীমত স্নান করাচ্ছে। জানিনা এ সুযোগে সূর্য ও বরুণ বেচারা মহেশ্বরকে একাকী পেয়ে রঙ্গ-তামাসা করছে কিনা ? তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মছাড়া কুকুর-বিড়াল, ভেড়া-ছাগলের অত্যাচার তো আছেই নিয়মিত—এছাড়া ছুঁচো টিকটিকি গিরগিটি—মায় শিবালঙ্কার সর্পকূলও নিশ্চিন্ত হয়ে বাসা বেঁধেছে মন্দিরের ভেতর। শুনেছি, সময় সময় পাজি ছেলেরা নাকি মা-বাবাকে জব্দ করবার জন্যে রাগ করে এসে আশ্রয় নেয় এখানে। মা-বাবা খুঁজে মরে, ছেলেরা মজা দেখে। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বর্ষার সময়। মন্দিরের পাশে বকুল গাছের ওপর বককুল এসে বাসা বেঁধে বিনা প্রতিবাদে ছানা তৈরি করে নেয়, সে সময় মন্দিরের চেহারা অবর্ণনীয়। লোকে দেখে আর হাসে, ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এ সবের প্রতিবাদ আর প্রতিবিধান যারা করবে তারা বুঝি স্বর্গের নন্দন কাননে পারিজাত ফুলের সৌন্দর্য দর্শন ও আঘ্রাণে মগ্ন। আর যাকে এ সবের তত্ত্বাবধানে ধর্মসাক্ষী করে প্রতিশ্রুত করা হয়েছিল দশের সামনে—যদিও সে মুমূর্ষু কাঙাল চৌধুরীর সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো সেদিন, তবে কাগজ কলম আইনের আওতায় ধরা পড়েনা বুঝে দশজনের মান ইজ্জতে মর্মান্তিক ভাবে আঘাত দিয়ে সবকিছু ভোগ দখল করছে খেয়াল খুশীমত।

আমরা জানি ভদ্রলোকেরা একবার মুটুকে মন্দির সংস্কারের

কথা বলতে গিয়ে রীতিমত নাজেহাল হয়েছিলো। কিন্তু সে দশজন ভদ্রলোক আর কোনকথা না বললেও আর যারা গ্রামে বাস করে—অন্ততঃ ঠোঁটকাটা বলে যারা কথিত, তারা মুটুর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেছিলো বারবার। বলা বাহুল্য, মুটু সবাইকে অগ্রাহ্য করেছে।

এমন কি পুরোহিত ঠাকুরকেও কেউ বশে আনতে পারেনি। সে প্রতিবাদ শুনে ঠোঁট উল্‌টে হেসেছে কদর্যভাবে তেল চিটচিটে উপবীত গোছাটা নাড়াচাড়া করতে করতে। সে খেয়াল খুশীমত এসে "নমঃ শিবায়" বলে আট-দশ খানা শতচ্ছিদ্র বেলপাতা শিবলিঙ্গের মাথায় চাঁপিয়ে দিয়ে কর্তব্য সাং। পূজার নৈবেদ্য দেওয়া হয় কিনা তা' পুরোহিতেরই জানবার কথা, যেহেতু নৈবেদ্য দেয় ও প্রাপ্য তারই। তবে এ্যালজেবরার প্লাস-মাইনাসের মত কাটাকাটি হচ্ছে কিনা নৈবেদ্যটি, ত সাধারণের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। অথচ নৈবেদ্যর চূড়ার মত তত্ত্বাবধায়কও পুরোহিত দিব্যি কাঙাল চৌধুরীর বিষয়সম্পত্তি ভোগদখল করছে আত্মভোলা শিবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে।

দেখে শুনে বেচারা শিব যেন হতবাক্। এত অত্যাচারেও প্রতিবাদ নেই, ক্ষোভ দুঃখ লজ্জারও বালাই নেই। দিব্যি খানকতক বেলপাতায় সন্তুষ্ট হয়ে বুঝি দিনদিন জড়ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। আর রাজ্যের জীবকুল জবর দখল সূত্রে সদাশিবের মহিমার সুযোগ সুখে উপভোগ করছে। অবশ্য মাঝে মাঝে আচম্বিতে মন্দিরের দু-এক খানা ইট খসে পড়লে তাদের সাময়িক ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু তাতে বাস্তুত্যাগ করে সরকারের কাছে—দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় প্রার্থনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। জেনারেল রিলিফের জন্য অঞ্চল প্রধানের কাছেও দাবি জানায় না তারা। এমনকি এ গণতান্ত্রিক রাজ্যে অতি সহজ ধর্মঘট, ঘেরাও, বন্ধ প্রভৃতি হুমকীরও কোন হুঙ্কার শোনা যায় না।—সব নির্বিকার।

অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস, যার ষোল আনা দাবি ছিল সব কিছুতে, যার নির্দেশে পূজার্চনার ক্রুটির প্রতিকার ছিল সহজ। সাধ্য, সে আজ সবকিছু থেকে বঞ্চিত বিধাতার অলঙ্ঘনীয় ইঙ্গিতে। দু'মুঠো ভাতের জন্য সে এখন ইতরভদ্র মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ। দয়া করে কেউ বা যদি একমুঠো ভাত দেয়—চৌধুরী বংশের মুখে মুঠোমুঠি ছাই ছড়িয়ে দেয়, কেউ বা কৌতুককণ্ঠে বলে, 'বাপের ধম্মপুত্তুরের কাছে যা-না খেপী ?—খেপী অর্থাৎ সৌদামিনী—ফকির চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে, আর ধম্মপুত্তুর হলো, নোটবিহারী সরকার —ওরফে নুটু।

খেপী কথা বলে কম। বলতে আরম্ভ করলে থামতে চায়না সহজে। অনর্গল বকবকিয়ে মরে। তখন তার কি প্রচণ্ড রূপ! প্রায় বিবস্ত্র বেশ-বাস, মাথার চুল আলুথালু আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অট্টহাসি।

কখনও মাথার চুল ছেঁড়ে আর মাটিতে মাথা ঠোকে ঠকঠক্ করে অশ্লীল ভাষায় বাপের চৌদ্দ পুরুষ বা নুটুকে গালিগালাজ করে অনর্গল।

হাসে আর মজা দেখে দর্শকেরা। খেপীকে ক্ষ্যাপায় আরও। দেখতে দেখতে ভীড় জমে যায়। ছেলে-বুড়ো-বুড়ীরা কৌতুক অনুভব করে খেপীর রূপ ও রঙ্গ দেখে—যা দেখে শুনে তাদের বেদনার পরিবর্তে ক্লেদাক্তমনের কদর্যরূপ প্রকাশ পায় উৎকটরূপে। কেউ কেউ ফকির চৌধুরীর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে খেপীর ভবিষ্যৎ চিত্রপট পর্যন্ত কল্পনা করে আতঙ্ক ও আহ্লাদের সীমানায় পৌছে আপনাপন বিজ্ঞতা প্রকাশ করে—অর্থাৎ জাহির করে ভণ্ডামির কারুকার্য শোভিত হৃদয়ের পরিচয়।

পিছিয়ে যেতে হবে সেই অতীতের দিকে। যেখানে সৌদামিনীর বিষাদময় জীবনের নেপথ্য লোকের কাহিনী লুকিয়ে আছে। পাকেচক্রে যে রাহুগ্রাসে জড়িয়ে পড়েছে, পিতার অপরাধের

প্রায়শ্চিত্ত করছে দশের অগ্নিপরীক্ষায়। দুঃখ তাড়িত আশ্চর্য তার জীবন অধ্যায়। ফকির চৌধুরীর যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই যেন সে জন্মেছে এ সংসারে। আজ বুঝি তার মেয়ে সেজে রূপরঙ্গের তামাসা দেখাতে সানন্দে আমন্ত্রণ জানিয়েছে জনসাধারণকে, আর যারা আজ দেখছে আর হাসছে তা তাদের সুদে আসলে উসুল করে নেবার সময় উপস্থিত। পাঁচজনের সামনে তার জীবনধারা আজ কৌতুকোজ্জ্বল স্নিগ্ধমধুর কাহিনী—সভ্যতার মাপ-কাঠিতে যা বীভৎস। অদ্ভুত!—আজকের সৌদামিনী সে করুণ সুরের যন্ত্রণাদগ্ধ ঘোর তিমিরাকাশের নীরন্ধ্র অন্ধকার পথের যাত্রী। কামনা উদ্বেল এক প্রাণপ্রাচুর্যময়ী তরুণী যেন বিবর্তনের টানে এ-এক অপরূপ নাটকের অদ্বিতীয়া নায়িকা। যেন এক বিশাল ভয়ঙ্কর সেতু অতিক্রম করবার জন্য সৌদামিনী আজ প্রস্তুত। দর্শক আগ্রহান্বিত, কাল রঙ্গমঞ্চ নিয়ে উপস্থিত।

আবহসঙ্গীত বেজে উঠেছে, পরিচালকের দৃষ্টি পড়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাবলী, আর মনে গুঞ্জন তুলেছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রথম সংলাপ— ।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

॥ আঠার ॥

ফকির চৌধুরীরা হালদার বংশের কুল পুরোহিত। তিন পুরুষ ধরে তারা হালদারদের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে আসছে। বিনিময়ে হালদাররা তাদের যে নিষ্কর জমি দান করেছে, তাতে তাদের খাওয়া-পরার অভাব হবার কথা নয়। অন্ততঃ দু' পুরুষের কোন অভাব অভিযোগ ছিলও না।

কিন্তু প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে বিনা অপরাধে সামান্য একটা ছল করে ঠেঙিয়ে শেষ করে দিয়ে ফকির দ্বিতীয় বার একটা বিবাহ করে অভাবটা টেনে আনলে। অধিক বয়সে বিয়ে করে অশান্তিরও সীমা ছিলনা তার। ফকির হিসেব করে দেখেছে, প্রথমার পিছে সারা বছরে যে খরচ ছিল,দ্বিতীয়া তার পদাধিকার বলে দ্বিগুণ খরচেও সন্তুষ্ট ছিলনা। তার আচরণ ছিল মধুর, এর আচরণ তার বিপরীত। কথায় কথায় হুল ফোটানো গঞ্জনা, তিরিক্ষি মেজাজ, দারিদ্র্যের নোটিশ পলকে পলকে।

অবশ্য সুনন্দার বাবা এমন কোন তালেবর ছিলনা যে তার মেয়ের ঔদ্ধত্য ক্ষমার্হ। মেয়েটার বিয়েই হচ্ছিলো না বলতে গেলে। কি একটা গর্হিত আচরণের জন্য মেয়েটার একটা বদনাম ছিল, বাপ সামর্থ্যের অভাবে সেটা আর চাপা দিতে পারেনি।

এমন সময় সুনন্দার বাবা সংসারে নিরঙ্কুশ ফকির চৌধুরীর সন্ধান পেল। যদিও সে জানতো ফকির তার স্ত্রীকে বিনাদোষে হত্যা করে হালদারদের কৃপায় বেশ কিছু সেলামী দিয়ে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, তথাপি তাকেই অনুনয় বিনয় শুরু করলে।

ফকির প্রথমটা না-না করে শেষে পাঁচজনের পরামর্শে বংশ রক্ষার জন্যে সুনন্দাকে বিয়ে করলে।

জ্ঞাতি শত্রুরা এ নিয়ে সমাজে একটা আলোড়ন তুলবার কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু হালদারদের যেখানে সমর্থন রয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু করে ওঠা অসম্ভব চিন্তা করে সমাজপতিরা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে চাইল না।

ফকির সুখ-শান্তিতে সংসার পাতলে।

কিন্তু সংসারে সুখ জিনিসটা এমনিই দুর্লভ যে কিছুতেই তা' গায়ের জোরে পাওয়া যায় না। শত সাধ্যসাধনাতেও মিলে না। ফকির নিরাশ হলো। তবে পৌরোহিত্যের হিল্লেয় সকাল-সন্ধ্যাটা বাইরে বাইরে কাটতে লাগল এই যা খানিকটা মনের শান্তি।

আসলে ফকির জ্বলতে লাগল অহরহ মনের কষ্টে। পূজার্চনায় আর তেমন মন দিতে পারে না। মন্ত্রের খেই হারিয়ে ফেলে মাঝে-মাঝে। ঘণ্টা বাজাবার সময় শাঁখ, শাঁখ বাজাবার সময় ঘণ্টা, আরতির সময় আপনমনে বিড়বিড় করে বকা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

হালদার বংশ এ অঞ্চলে ধনী ও মানী। বর্ধমানে তাদের বিরাট ব্যবসা। কর্মের খাতিরে প্রায় সবাই সেখানে থাকে। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজ হালদার নিমাইচাঁদ সস্ত্রীক গ্রামে বাস করে। বিরাট চাষের তত্ত্বাবধান ও পূজাপার্বণ নিয়েই তারা ব্যস্ত।

মেজ গিন্নীর পূজার্চনায় বেশ শ্রদ্ধা আছে। সে প্রতিদিন পূজার সময় এসে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরে বসে থাকে। পূজার্চনায় ত্রুটি বিচ্যুতি ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। ক'দিন ধরে ফকিরের পূজাতে অমনোযোগিতা লক্ষ্য করে না বলে আর থাকতে পারলে না সেদিন,—'ঠাকুরমশাই কি দ্বিতীয় সংসার করে আর মনটা সামান্যক্ষণের জন্যেও ঠাকুরের কাজে দিতে পারছেন না ?'

ফকির অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'না—না, তা ঠিক নয় হালদার গিন্নী, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না ক'দিন থেকে তাই—'

—'ছুটি নিন, দিন কতক !'

ছুটি নেওয়ার জ্বালা, কাঙাল জানে। ছুটি নিলেই অহর্নিশি সুনন্দার খপ্পরে পড়ে প্রাণটাই চলে যাবে হয়তো শেষ পর্যন্ত। তাই বিনীত স্বরে বলে, 'না—না ছুটির প্রয়োজন নেই—। আজ থেকে কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে।'

—'বলি, গৃহিণীর সঙ্গে বেশ বনিবনা হয়েছে তো ঠাকুর মশাই?'

একটু হেসে ফকির বলে, 'হেঁ—হেঁ! কি যে বলেন—'

হালদার গৃহিণী একটু মুচকি হেসে বলে, 'দেখবেন যেন আবার খেয়ালের বশে পূর্বানুবৃত্তি করে বসবেন না। অনেকদিনের পুরোহিত আপনারা তাই কর্তা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেসটা সামলে নিলেন।—বদরাগটা সামলে চলবেন, বুঝলেন?'

ফকির মনের দুঃখের কথাটা এই ফুসরতে একটু খুলে বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু আর বলতে সাহস করলে না। মাথা নেড়ে বলে, 'সেজন্য আমিও কি কম অনুতপ্ত মেজ গিন্নী? তবে কি জানেন, সংসারী মানুষের শান্তি নেই, বড় জ্বালা—বড় কষ্ট!'

—'কিসের কষ্ট ঠাকুর মশাই, আপনার সংসারে কি কোন অভাব আছে?—লুকোবেন না, বলুন। আপনি কুল-পুরোহিত, আপনার দারিদ্র যেন ঠাকুর সেবাতে বিঘ্ন না ঘটায়—এ দেখা আমাদের কর্তব্য।'

ফকির বুঝতে পারে ক্রমশঃ অসল কথাটা ফাঁস হয়ে যাবার উপক্রম নিজের অজ্ঞতাবশে। তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'না-না, কথাটা শুধু আমার নয়, প্রায় সর্বসাধারণের। দেখছেন না দুনিয়ার হালচাল—তাদের দুঃখকষ্ট।'

মেজ গিন্নী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'তাহলে আপনি শুধু নিজের ভাবনা নয় দুনিয়ার কথাও ভাবেন?'

—'আমার ভাবনা তো আপনারাই ভাবেন মেজ গিন্নী—সবই তো আপনাদের কৃপায়।'

'ভুল বললেন ঠাকুর মশাই, বলুন রাধাকৃষ্ণের কৃপায়, তাঁরই অনুগ্রহে। এই যে আমরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—সেও তো

তাঁদের আশীর্বাদে। তাঁদের দয়া হলে সবই সম্ভব। তিনিই কৃপা করেন…।' বলেই মেজ গিন্নী গলবস্ত্র হয়ে বিগ্রহের সামনে সশ্রদ্ধায় মাথা নত করে এবং উঠে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই ফকিরের সামনে হেঁট হয়ে প্রণাম করে, দু'পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, 'রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করুন, তিনিই আপনার সব দুঃখকষ্ট ঘুচিয়ে দেবেন। আমি সামান্য মেয়ে আপনাকে আর কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারি?'

ফকির আর দাঁড়ায় না। মন্দিরের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা মেজ গিন্নীর হাতে দেয়।

মেজ গিন্নী অন্দরে চলে যায়

হালদার বাড়ী থেকে ফকিরের বাড়ী দশ মিনিটের পথ। সারাটা পথ ফকির ভাবতে থাকে মেজ গিন্নীর সঙ্গে তার কথোপকথন। ধনীর মেয়ে মেজ গিন্নীর খ্যাতি আছে নিরহঙ্কার ও অমিতব্যয়ী বলে। গাঁয়ের লোক মেজ গিন্নীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনপুরুষ আগে সেই যে বংশের ভিটিতে রাধকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে, তখন থেকেই যেন বাড়ীর সকলে প্রেমের ভাবধারায় স্নাত। পাঁচ বছরের ছেলে থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়ো পর্যন্ত মধুর ব্যবহারে সবার মন জয় করে ফেলেছে। ঠিকই বলেছেন মেজগিন্নী, সবই রাধাকৃষ্ণের কৃপায়। তা না হলে যে মেয়েটার একটা অখ্যাতির জন্য বিয়ে আটকে ছিলো দীর্ঘদিন, বাপের সামর্থ্যের অভাবে কিছুতেই সে বদনামটা ঘোচানো যাচ্ছিল না—সে মেয়েকে বিয়ে করে তার ফোঁসফোঁসানি কেন সহ্য করতে হবে তাকে?

শালীনতার সীমা ডিঙিয়ে একটা ঔদ্ধত্য সদাসর্বদা প্রকাশ পাচ্ছে সুনন্দার কথাবার্তা ও চালচলনে। বিধাতা যেন তার জন্য সংসারের প্রতিটি মুহূর্ত যন্ত্রণায় মুড়ে রেখেছেন।—তার আশ্চর্যের সীমানা ভেঙে চুরমার করে দিলে সুনন্দা।

কাঙালের আশা ছিল গরীবের অবহেলিত মেয়েটাকে বিয়ে করে শান্তি পাবে। সুখের হবে ঘরকন্নাটা।

কিন্তু আশাবাদী মানুষের ধারণা সঠিক বলবার উপায় নেই। বহুলাংশে সফল নাও হতে পারে। বিচিত্রতম বেঁচে থাকার স্বাদ। বিশ্বের বিভিন্ন স্বাদে পরিপূর্ণ। কটু কষায় তিক্ত মধুর ইত্যাদির সমাবেশে এক অবর্ণনীয় স্বাদ। জন্মের খাতিরে পৃথিবীর এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো যার বাইরে আর যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধান করতে হবে। আস্বাদ নিতে হবে ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক, লৌকিক, পারলৌকিক, দৈবিক ইত্যাদির, তারপর হবে নিজেকে খাপ খাওয়াবার বা বিদ্রোহ ঘোষণার পালা—হারা-জেতার জন্য লড়াই।

আশার মৃত্যু নেই আমৃত্যু। বলতে গেলে আশার চাবিকাঠি নিয়ে মানুষ বাঁচে। আশার পরীক্ষায় অন্ততঃ পাশের নম্বর থাকলে বেঁচে থেকে কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু ফেল করলে আর বেঁচে থাকার স্বাদ উপভোগের প্রবৃত্তি থাকে না। মনে হয় মরলেই জুড়োবে হাড় ক'খানা।

পারুল এবার উদাসকণ্ঠে বলে, 'তোমাকে আশার চাবিকাঠিই বড় করেছে ; আশার চাবিকাঠিই তোমাকে গ্রাম থেকে শহরে এনে ধন-মান-যশ দিয়েছে অথচ কেন তুমি এত ভয় পাচ্ছো ?

—'যেহেতু এসব আসল নয় বলেই, আমার মনে আজ এ প্রবল ঝড়।'

—'কিন্তু তুমি তো জান মরবো বললেই মরা যায় না। আশার চাবিকাঠি ভরসা দিয়ে আগিয়ে নিয়ে চলে, ডবল প্রমোশনের মরীচিকা দেখিয়ে বুকের স্পন্দন বাড়ায়। সংসারের বন্ধন এসে মায়া বাড়ায়। আশা আর মায়ার যোগাযোগে বেঁচে থাকার বিচিত্রতম স্বাদ উপভোগের জন্য মন নামক চিনেও না-চেনা অজানা অতল পদার্থটা হ্যাংলার মত আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে দুঃখ বাড়ায়। সান্ত্বনা হয় দোসর।'

ঠিকই বলেছো তুমি পারুল। অতুলনীয় তুলাদণ্ড সুখ দুঃখের

স্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠে আবার মনের আকাশ। রামধনু এঁকে চলে আলো-আঁধারের—পটভূমিকায়। পাশ-ফেল যাচাই হয়। জাঁকিয়ে বসে পরীক্ষক। অতৃপ্ত মন পরীক্ষকের ভূমিকায়—পাশ করলে উৎসাহিত করে, ফেল করলে সান্ত্বনা দেয়।—যদিও এ দুনিয়ায় যারা ঘর বেঁধে সংসার পেতেছে তাদের অধিকাংশই আজকের দিনে ফেল, তথাপি অতৃপ্ত মনটাকে বুঝিয়ে সাম্য করবার মত শিক্ষা বা ধৈর্য ক'জনের আছে? একদিন অবশ্য এসব চিন্তা আমার কাজে লেগেছিলো আজ এসব ভাবতেও গা ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে। তবে দেখলাম, শুধু আমিই রাহুগ্রাসে জড়িয়ে পড়িনি—এর ঢেউ অনেক জায়গায় পৌঁচেছে।

॥ উনিশ ॥

বিবিধ প্রবোধবচন আওড়ে ফকির মনের মোড় ফেরাবার চেষ্টা করে। ছদিনের সংসারকে, 'পদ্মপাতে জল', 'সংসারে কেউ কারো নয়,' 'কলিযুগে হরিনাম সত্য' ইত্যাদি বলে। সুনন্দা মুখ টিপে হাসে, ঢের হয়েছে, স্যাকরাকে ডেকে নতুন ডিজাইনের নেকলেসটা গড়িয়ে দাও দেখি ?'

ফকির নিজের অক্ষমতার কথা বহুবার জানিয়েছে সুনন্দাকে। সময়-সুযোগ মত নেকলেসটা গড়িয়ে দেবার কথাও বলেছে। তথাপি সুনন্দা নাছোড়বান্দা। চীৎকার করে ওঠে সময় সময়, তবে কেন বিয়ের আগে বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, আধুনিক সভ্য সমাজের মেয়েদের মত যা যা দরকার সব গড়িয়ে দেবে ?

ফকির ভাবে সুনন্দার কেলেঙ্কারীর কথাটা একবার বলে, কিন্তু পরক্ষণে নিজের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে থেমে যায়। মেজ গিন্নীর কথামত রাধাকৃষ্ণকে ডাকে। ওঃ, কেন সেদিন নিষ্ঠুরভাবে প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করলে ? অপরাধ ত অতি তুচ্ছ !

দীর্ঘদিন কোন সন্তানাদি না হওয়ায় স্বাতীর মনে কোন শান্তি ছিল না। তাই পাশের বাড়ীর একটা মেয়েকে-নিজের মেয়ের মত ভালবাসতো সে, এবং কাছে কাছে রাখত।

মেয়েটির মা চারটি ছেলেমেয়ের জননী। একটা অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলো কিছুটা, পূজার্চনায় বাইরে অনেকক্ষণ থাকতে হচ্ছে, বাড়ীতে দ্বিতীয় কেউ না থাকায় বেশ আগ্রহ ভরেই স্বাতীর ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলো।

এক বছরের মেয়েটা সাতে পড়লো। হঠাৎ মেয়েটির বাবার সঙ্গে ফকিরের গণ্ডা দশেক জায়গা নিয়ে মামলা শুরু হলো। ফকির স্ত্রীকে নিষেধ করে দিলে মেয়েটাকে নিয়ে আদর করতে।

স্বাতী মেনে নিতে পারলে না স্বামীর কথা। দীর্ঘ সাত বছরের

স্নেহ মমতা একদিনেই বিসর্জন দিতে নারীহৃদয় কিছুতেই সায় দেয় না। মেয়েটাও বাপমায়ের কথামত স্বাতীর কাছে না গিয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য সবই ঢিলে তালে চলে। স্বাতী আর অনুরাধার স্নেহের কমতি না থাকলেও যে যতটা করে আপনাপন অভিভাবকে আড়াল করে চলে।

হঠাৎ সেদিন ফকির স্ত্রীকে আগের ন্যায় অনুরাধাকে আদর করা দেখে ক্ষেপে ওঠে। কথাটি বলে না সে সময়। গভীর রাতে টুঁটি টিপে ধরে—বলো, আর কক্ষনো অনুরাধাকে নিয়ে সোহাগ করবে না? জানো, লোকের কাছে তার বাবা বলে বেড়াচ্ছে তুমিই নাকি নাছোড়-বান্দা, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসো—এবং সময় পেলেই তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবো আমরা? আর এসবের মূলে নাকি আমি!

চাপাস্বরে স্বাতী বলে, মিথ্যে কথা! আমার প্রাণ থাকতে তা পারি না। আমার সন্তান নেই বটে,—জানিনা সন্তানস্নেহ কেমন, কিন্তু বলতে পারি হলপ করে, অনুকে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি। এতটুকু কৃত্রিমতা নেই সে স্নেহে। দোহাই, তুমি বিশ্বাস করো!

আমার বিশ্বাসে তাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেন তাদের অবিশ্বাসের ধার ধারব বলতে পারো? বলো, কক্ষনো ও মেয়েটাকে নিয়ে আর আদর করবে না? এবং আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না?

'ও শিশু, ওর দোষ কি বলো? না—না, আমি পারব না—পারব না, ওকে ছেঁড়ে আমি একদণ্ডও থাকতে পারব না; আমি জানি ও-ও পারবে না আমাকে ছেড়ে থাকতে।

যাতে পারে তাই করছি। ফকির স্বাতীর গলা টিপে ধরে এবং শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলে। এতে তার এতটুকু হাত কাঁপল না, প্রাণ টলল না—বরং পৈশাচিক উল্লাসে নিজের দম্ভ বজায় রাখলো।

পরদিন কেরোসিন তেলে অর্ধদগ্ধ স্বাতীর দেহটা দেখিয়ে পাঁচ-জনকে ফকির জানালে, সে আত্মহত্যা করেছে।

বলাবাহুল্য লোকের সন্দেহের নিরসন হ'ল না। অনুরাধার বাবা এরকম কাণ্ড দেখে ফকিরকে জায়গাটা বিনাদ্বিধায় ছেড়ে দিলে। থানা পুলিশ না করলেও গ্রামের লোক জানলে ও দেখলে, দশ গণ্ডা জায়গার দাম স্ত্রীর চেয়ে নাকি অনেক বেশী। ক্ষমতার দম্ভ স্নেহের কাছে পরাভূত।

ফকিরের মন ক্রমশঃ ম্লানদীপ্তিতে ভরে ওঠে। বিষয় বিষের মাদকতায় উগ্র অন্তরে যে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে ফকির নিজেও ভাবতে পারেনি। ভুলতে পারা যায় না সে লোমহর্ষ কাণ্ড, আর ভুলতে পারা যায় না প্রথমা প্রেমিকার সে প্রেম।

হয়তো ফিরে পাবে মনে সান্ত্বনা, আসবে ফিরে আবার সে মধুসংলাপময় দিনগুলো সুনন্দার আগমনে। মনের দেউল তৃপ্তি-সুখে ভরে উঠবে কানায় কানায়। ছন্দহারা এবম্বিধ জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে ভরে উঠতেও পারে প্রাণপ্রাচুর্যে। অতৃপ্ত মন নতুন প্রাণস্রোতের কল্পনায় স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু স্বপ্ন বাস্তব নয়।

মনে অনেক কিছু করা যায় বটে কিন্তু উপায়ান্তর বিহীন মানুষ যতই যন্ত্রণায়-লাঞ্ছনায় ছটফট করুক, সেই বাঁধাধরা পথ ধরেই মানুষকে আগিয়ে যেতে হয়।

ছিল একটা সাজানো সুখের সংসার। যেখানে ছিলনা কোন দুঃখ বা অশান্তির লেশমাত্র, সেরকমই একটা নতুন সংসার পেতে দুঃখ-অশান্তি ঘিরে ধরলো আচম্বিতে। দম্ভের কৃত্রিম জগতে মানুষের শান্তি নেই, মানুষ হার মানে না। অথচ শেষের দিনে সবাই হারে—চূড়ান্ত পরাজয়ের কালিমা মুখে লেপে—নির্বাক নিস্পন্দ দেহখানাই তার প্রতীক।

নতুন আশা, নতুন আশ্বাসের বাণী সম্বল করে আগিয়ে চলে ফকির চৌধুরী। সত্যকার জগৎ আজ বুঝি কৃত্রিমতায় ভরা।

পারুল বলে, তোমার সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়ের কথা হয়নি একবার? আমি অবশ্য চৌধুরীদের অত সব কাণ্ডের কথা জানতাম না, কিন্তু বিয়ের কথাটা একবার শুনেছিলাম যেন।

হয়েছিলো বটে, কিন্তু বাবা অমত করেছিলেন। কেন তা' সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবে। তবে আমি ভাবছি কি জানো, যদি হতো, তবে আজ আমি এ শঙ্কিত চিত্ত নিয়ে সর্বদা মৃত্যু কামনা আর সশঙ্ক মন নিয়ে থাকার হাত থেকে রেহাই পেতাম।

*　　　*　　　*　　　*

মর্মবেদনায় মনশ্চক্ষু যায় খুলে, যে চোখের রং তখন ঘোলাটে—ছানিপড়া। যে চোখদুটো নিস্তেজ হয়ে শুধু পাথরের চোখের মত কাঁদে। অশ্রু বিহীন সে ছুটো চোখের ভাষা বড় করুণ—বড় বেখাপ্‌পা। হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর অপঠিত শীলমোহরে অঙ্কিত লিপির মত অপাঠ্য বর্ণ ও ভাষার সঙ্গেই যার তুলনা চলে।

সেদিন মেজগিন্নীর উপদেশটা বড় মনে ধরেছিল ফকিরের। প্রতিদিন পূজান্তে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের কাছে কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা জানায়, 'শান্তি দাও, অর্থ দাও—সব দুঃখ ঘুচিয়ে দাও!'

বিগ্রহ কথায় জবাব দেয় না। তাই বিগ্রহের সঙ্গে মানুষ ঝগড়া করতে পারে না—ফল না পেলেও। তা' না হ'লে বাঘাবাঘা উকিল-ব্যারিষ্টারকে মোটা টাকা ফি দিয়ে বিগ্রহকেও গ্রহবিপাকে ফেলতে আজকের মানুষ ছাড়ত না। ফলাফল চাই হাতে-নাতে তবেই এ বিংশ শতাব্দীর মানুষ শুনবে মানবে তাকে। দেব-দেবীকে করায়ত্ত তার সাধ্যাতীত—যদিও দু-পাঁচজন মহাপুরুষ তা' পেরেছেন, যে মানুষের সঙ্গে আজকের 'সবেতেই মুনাফাখোর, স্বার্থান্বেষী' মানুষের তুলনা অচল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মায়ের কাছে প্রার্থনা করে সার বুঝেছিলেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" লোভ থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন পরমাত্মার সান্নিধ্য পেয়ে। আজ আমরা মাটিকে টাকা বানাই, সে টাকায় মেয়ের বিয়ে দিই, ইমারত, বাড়ী, গাড়ী কিনি——তিনপুরুষ বসে খাবার সংস্থান করতে সর্বদা সচেষ্ট হই। তবে অধর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দু-পাঁচশো যে কোন সময় খরচ না করি তা' নয়। কিন্তু যারা গতর মাটি করে আমাদের সুখ যোগায়, তারা মাটিতে মিশে যায় ইহকালেই। অর্থাৎ আমরা পরকাল মাটি করবার কৌশল করায়ত্ত করে বৃথা আস্ফালন করি, যে মাটি মাটির মানুষের—পরকাল মাটি করবার জন্য বদ্ধপরিকর মানুষের জন্য নয়।

কাঙাল চৌধুরীর ইহকাল মাটি হবার যোগাড়, পরকালের ভাবনা সে তেমন ভাবে না।

কাঙাল ভাবে কি কুক্ষণেই না সে বিয়ে করেছে।

প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় নতুন করে সংসার পেতে প্রাণশঙ্ক প্রাণ-সংশয়ের প্রান্তদেশে আজ নিবীর্য নিস্তেজ যেন। অথচ আগেকার দিনগুলো কি সুন্দর ছিল।

বদলে গেছে সে দিনগুলো। আকাশজোড়া তারার মেলা আজ যেন বড় করুণ। রূপকথাতেই যেন তারা ভাল ছিল। চাঁদের কলঙ্ক, তার স্নিগ্ধ আলো, তার সঙ্গে 'মামা' সম্পর্কের যে নিবিড় আত্মীয়তা পাতানো হয়েছে তা' বুঝি বিচ্ছেদের ভূমিকায় আজকের মানুষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। মহাকাশযান আজ তার চুলচেরা বিচার করবে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান নেবে। হয়তো তাতে চাঁদের ওপর আমাদের আধিপত্য বাড়বে নিঃসন্দেহে, কিন্তু আত্মীয়তার অনেকখানি যাবে ম্লান হয়ে। চাঁদ শুধু চাঁদ—পৃথিবীর উপগ্রহ হয়েই ভূগোলে ঠাঁই পাবে। আমরা ভাগ্নেরা যাব পর হয়ে। আমাদের বংশধরেরা আর বংশানুক্রমিকভাবে বলবে না 'চাঁদ মামা'।

হাসবে পরবর্তী কালের ছেলেরা,—এত মূর্খ ছিল সে যুগের মানুষগুলো?—চাঁদকে মামা বলতো? আশ্চর্য!

রূপচর্চা আছে, রূপের বেসাতি আছে, রূপকে তুলে ধরবার জন্য সর্বোচ্চ বিশ্বসুন্দরী আখ্যায় সম্মানিত হবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রূপকথার বালাই নেই আর তেমন। নেই সে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার দল—যারা জীবনের শেষ দিনগুলো নাতিনাতনীদের মধ্যিখানে বসে রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে তাদের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-সমুদ্রের তলদেশে। মুগ্ধ চোখে বিমুগ্ধ হয়ে যেসব শিশু শুনবে রূপরাজ্যের কথা। প্রাণটার এক কোণেও অবিশ্বাসের এতটুকু ঠাঁই না দিয়ে সব বিশ্বাসের মূলে একেবারে সমর্পণ করে দেবে। আর ফেলে আসা সে জীবনের কটি মুগ্ধ প্রহরের অতুলনীয় আস্বাদ অনন্যতায় ভরিয়ে নেবে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার দল।

সেদিনগুলোর তুলনা সেদিনগুলোর সঙ্গেই চলে—আজকের পৃথিবীর সঙ্গে নয়। না—তা'ও ঠিক নয়, আজও পৃথিবীতে তেমন জায়গা আছে বৈকি যেখানে আধুনিকতার বিজয়বার্তা সদম্ভে শিকড় গেড়ে বসেনি। মুছে দেয়নি প্রাচীন দৈনন্দিন জীবনের শ্লথমধুর কল্পলোক কাহিনী থেকে বিশ্বাসের মূলটুকু।

দৈনন্দিন জীবনধারা আজও হয়তো সেখানে ভোরের আলোর সঙ্গে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। ভোরের পাখীর ডাক লোকে তেমনি করেই শোনে। বার মাসে তের পার্বণ বিশেষ আদেশনামায় চিনি ছাড়া গুড়ের নাড়ু দিয়েই সারা হয়। রাখাল গরুর পাল নিয়ে উদয়াস্ত মাঠে কাটায়। বাড়ীর বউ-ঝিরা অতিথি-অভ্যাগত-ভিখারীকে 'নারায়ণ' বলেই মনে করে। ক্ষণার বচনের সঙ্গে সঠিক তাল রেখে মেয়েরা বাড়ীর উঠোনে লঙ্কা-কুমড়া-শশার বীজ যথাসময়ে রোপণ করে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে দেবাদেবী জ্ঞানে ভক্তি করে। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে একজন কর্তা একজন গৃহিণীর আদেশে আর সবাই উঠবস করে, আটপৌরে

সাদাসিধে পোষাকে সন্তুষ্ট হয়। সিদুঁর-আলতা ছাড়া স্নো-সেন্ট-ফেস পাউডার, টুথ পাউডার, নোজ পাউডার মেখে সঙ্‌ সাজে না। শাঁখা-নোয়া পরে মণিমুক্তোর চেয়েও মূল্যবান অলঙ্কারের সাধ মেটায় নির্ভেজাল মন নিয়ে। একসূত্রে বাঁধা একটা পরিবার, সবাই সবার সুখেদুখে সমান অংশীদার। দু-দশ গণ্ডা জায়গা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কোর্ট-কাছারী করে অর্বাচীনের মত দু-পাঁচ হাজার টাকা খরচ না করে বড় জোর গ্রাম্য সালিশী সানন্দে মেনে নেয়। হারাজেতার জন্য কোন পক্ষের উল্লাস বা মনস্তাপ নেই। খাঁটি নির্ভেজাল মন নিয়ে পরস্পর প্রাণখোলা মন নিয়ে কথা বলে। কেউ কাউকে ঠকিয়ে নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে না, বেকুবের মত হাসেও না।

পারুল একটু মুচকে হেসে বলে, তোমার মুখে আজ এসব কথা শুনে কি মনে হচ্ছে জান ?

মুকুল বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে, তোমার বলবার আগে আমি এটুকুই বলতে পারি, আমি সে মুকুল সর্বাধিকারী নই, আমি যেন অন্য এক মানুষ। যা' বলছি তা' আমার পক্ষে শোভা পায় না বলা, এইতো ?

সত্যি তাই—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যেন। বুঝিবা রূপকথা শুনছি অবাক হয়ে, আর ততোধিক অবাক হচ্ছি বক্তার বাচনভঙ্গী দেখে।' বেশ, বলো আবার ফকির চৌধুরীর সংসারে কেমন করে আগুন জ্বলে উঠলো।

সংসারে আগুন জ্বালতে চকমকি বা দেশলাইয়ের প্রয়োজন হয় না। এ আগুন জ্বলে ওঠে মনের কোণে আর দুঃখতাড়িত মন সৃষ্টিকর্তা সে আগুনের। যেমন আমি একদিন দুঃখের আগুনে জ্বলে উঠে মাঝখানে কিছুদিন শান্তি পেলেও আজ সে আগুনেরই বেড়াজালে জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছি।

তখনকার দিনে এত দালান-কোঠা ছিল না, পাড়াগাঁয়ে বিরল

বললেও ক্ষতি হয় না। লোকে বিলাস-ব্যসনের ধারেকাছেও যেত না,মোটা ভাত-কাপড়েই মানুষের মনে শান্তি এনেছে—সুখ-সমৃদ্ধির সহায় হয়েছে। কৃষ্টি-পরিষদ, সংস্কৃতি-পরিষদ, ন্যায়-পরিষদ গঠন করেও আজ যা' সমাজ পাচ্ছে, তখন বড় জোর রামায়ণ-মহাভারত পড়ে বা শুনে মানুষ কোন পরিষদ না করেও তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছে। অবশ্য সমাজে তখন মানুষের মত মানুষ দু-চারটে মিলতো—আজ বহু খোঁজখবর ও যাচাই করে মানুষের মত মানুষ মেলে কোটিতে এক-আধটা। তখন মানুষকে বিশ্বাস করা যেতো সহজে। বিশ্বাসভঙ্গের নজীর যে ছিলই না তা নয়, তবে আজকের মানুষের মন এত ভেজাল হয়ে উঠছে দিনের দিন যে, সে যুগের কোন নরকঙ্কালও শুনলে হয়তো দাঁত কিড়মিড় করে উঠবে। যদিও আজ আমারই মত অধিকাংশ মানুষের নাম দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত—খবরের কাগজে যাদের নাম বেরুচ্ছে, দশের সামনে হাততালি কুড়োচ্ছে দুটো কথা বলে। আর সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রে ফটো আর ভাষণ পড়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, মানুষ না দেবতা ?

দেবতারা হয়তো অলক্ষ্যে ততোধিক বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, মানুষকে দিতে তাদের আর বোধ হয় বিশেষ কিছু বাকী নেই ; যা আছে তা' তাদের কোনদিনই দেওয়া হবে না। সে আছে অতীব সাবধানে যক্ষের মত আগলে রাখা গুপ্তধন—শান্তি ! অসীম অশান্তির সমুদ্র ডিঙিয়ে মানুষ যাবে না সেখানে বরং যেখানে যত গণ্ডগোল যত রাজ্যের কুৎসিত ব্যভিচার সেদিকেই তার তীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টি। সে নোংরা রাজ্যে প্রবেশে তার তীব্র ব্যাকুল প্রচেষ্টা।—বে-ইজ্জতের ভয় করে না তারা।

ইজ্জত !

ইজ্জতের অস্তিত্ব আজ বে-ইজ্জতের ঘর করে। বজ্জাতির চরম পরাকাষ্ঠা বুঝি মানুষের করতলগত। তাই বেপরোয়া তার প্রকাশ।

অপ্রকাশের ভাবভাষা যদিও মাঝে মাঝে মনে ধাক্কা দেয়, তথাপি তাকে আমরা ধমকে থামিয়ে দিই। অস্তিমজ্জাগত বেইজ্জতকে ইজ্জত বলে খাড়া করে নকলের ঘর করি। নকল মনুষ্যত্বকে আসল বলে চালিয়ে দিই দশের সামনে। ভুলচুক স্বীকার করি না। অক্ষমতা জ্ঞাপন বোধ হয় কোষ্ঠিতে লেখা নেই, তাই সত্য হয় কেবল নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাথে ছিটে ফোঁটা সমাজের মানুষকে জিইয়ে রাখবার কৌশল। অপরাজেয় প্যাঁচালো বদ্‌বুদ্ধি আর ভাষার জোরকে তাকে অমৃত বলে সাধারণ মানুষ মনে করে।

এ যুগে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নেই যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে দু' চোখে কাঁটা ফুটিয়ে লালসার নিবৃত্তি ঘটাবে—নিজেকে নিজে অভিশাপ দেবে। বরং চোখ দুটোয় এক জোড়া দামী চশমা লাগিয়ে আর সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়াই তার লক্ষ্য।

যেখানে সুখ নেই, শান্তি নেই, সেখানে সব অনিয়ম। অন্তহীন অনুকরণ আর ভোগের লালসায় আজকের সামাজিক মানুষ বিব্রত। এ পৃথিবীর এক কোনায় হয়তো আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত জঙ্গলে পিগমীরা কিছুটা শান্তিতে আছে। আর সব মানুষই স্বেচ্ছায় স্বোপার্জিত অশান্তির চিতাবহ্নিতে অহরহ জ্বলেপুড়ে মরছে। দুর্লভ মরীচিকার স্বর্ণমৃগের পেছনে চলেছে তার পশ্চাদ্ধাবন। অবশ্য এর পরিণতি একদিন মানুষ বুঝতে পারবে। সেদিন বুকফাটা আর্তনাদ করেও কোন ফল হবে না।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সে আর বলতে, নিজের চোখের সামনেই তা' প্রত্যক্ষ করছি'। বেশ শেষ করে দাও তাড়াতাড়ি কথাগুলো। আর ভাল লাগছে না গ্রাম্য মানুষের—বিশেষ করে সৌদামিনীর দুঃখের কথা শুনতে। কত ছোট সে মেয়েটিকে দেখে এসেছিলাম, আজ সে পাগলিনী, বিধবা—সর্বহারা। ওঃ কি অভিশাপ নিয়েই না মেয়েটা জন্মেছে !

'আমারও কি আর বলতে ভাল লাগছে পারুল এ সব কথা ? তবে মিলিয়ে নিচ্ছি—হয়তো আমার অভিশপ্ত মন কিছুটা শান্তি পাচ্ছে এই ভেবে যে, শুধু আমিই নই—ফকির চৌধুরী কি-না করলে শেষ কালে দারিদ্রের তাড়নায়! যে হালদাররা জমিদান করে পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলো, তাদেরই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের যাবতীয় অলঙ্কার চুরি করে এনে নিজের অবস্থা ফেরালে দুদিনের জন্যে।

পারুল শশব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, কেন হালদাররা থানা-পুলিশ করলে না ?

না। শুধু ফকির চৌধুরীকে মন্দিরে উঠিয়ে বিগ্রহের সামনে বলিয়ে নিলে সে চুরি করেছে কিনা ?

ফকির অম্লান বদনে বললে—না, সে চুরি করেনি।

এক সপ্তাহের মধ্যে হালদাররা ঠাকুরের যাবতীয় অলঙ্কার তৈরী করিয়ে দিলে। নতুন পুরোহিত নিযুক্ত করলে অর্থাৎ আগের মতই সব রয়ে গেল। কিন্তু ফকির চৌধুরী ? - অলঙ্কারগুলো বিক্রী করে মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে দিলে, হয়ত বা পাপপুণ্যের কাটাকাটির জন্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করলে, কিন্তু সব উলটে গেল দুদিনে।

মেয়েটা বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলো। সুনন্দা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে। ফকির নোটন সরকারকে সবকিছু দেখাশোনার ভার দিলে দশজনের সামনে, শিবপূজারীকে জমি দান করলে, মেয়েটার দু-মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করলে নোটনের কাছেই—কিন্তু কে কোথায় এখন! কোথায় বা সুচারু ব্যবস্থা। কে কাকে গ্রাহ্য করে ?

একটু ঝিমিয়ে থেকে চীৎকার করে ওঠে মুকুল, না—না অসহ্য! অসহ্য এ দৃশ্য। দেখেশুনেও আমাদের চৈতন্য হয় না। পারুল—পারুল -কি প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। কোথায় শান্তি! কোথায়

শান্তি! অর্থ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। না—না, আমি শপথ করে বলতে পারি, টাকার রং লাল—কাল নয়। হতে পারে না।

পারুল বৃথা শান্ত করবার চেষ্টা করে মুকুলকে। মুকুল তখন হাঁপাচ্ছে।

॥ কুড়ি ॥

মাস ছয়েক পরের কথা।

পরের ঘটনাগুলো অতীব মর্মান্তিক। স্থির হলো না আর মুকুলের সে অশান্ত হৃদয়। যে দেহের শিরায় শিরায় একদিন অর্থ-লালসা উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো, আজ সে দেহ-মনের প্রতিটি রক্তকণা অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। অর্ধ উন্মাদ সে এখন, থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে, 'টাকার রং লাল—কাল নয়, হতে পারে না।'

ব্যবসায়েও শিথিলতা এসে গেছে। রামগোপাল অবশ্য এখন প্রায় সময় ব্যবসা দেখাশুনা করে। যদিও সে তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিবিধ আমোদ-প্রমোদ থেকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয়। তবে মুকুল সর্বাধিকারী এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ থেকে মাস খানেক আগে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে নকল হিসাবের কারচুপিতে। এরপর থেকে সেই যে মুকুল মাঝে মাঝে 'হো-হো' শব্দে হাসে, সে হাসি কারও আভাস-ইঙ্গিতে, অনুনয়-বিনয়ে, ভয় দেখিয়েও থামানো যায়নি আজও। রাতদিন হাসছে আর বিড়বিড় করে বকছে, 'টাকার রং লাল—কে বলে কালো?' হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চূড়ান্ত পাগলামির পর্যায়ে উপস্থিত মুকুল। তবে তাকে রাঁচি পাঠাবার সঙ্কল্প বা পাগলের চিকিৎসা থেকে রামগোপাল ও পারুল হার মেনেছে।

ওকথা উঠলেই, চীৎকার করে ওঠে মুকুল,—'না-না-না, বৃথা সে চেষ্টা করো না। আমাকে জীবনের বাকী দিনগুলো, পাগল হয়েই থাকতে দাও। যদি জোর জবরদস্তি করো, গুলি, করে মারবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! টাকার রং লাল হয়েও কালো, সে কেবলমাত্র হাতের গুণে আর বুদ্ধি কৌশলে!'

দেওয়ালে টাঙানো নিজের ফটোর কাছে গিয়ে কখনো চীৎকার

করে ওঠে, 'তুমি কি বলো টাকার রঙ কালো ? না-না, এ হতে পারে না, টাকার রঙ লাল—সব টাকাই কিন্তু, তাতে কালিমা লেপন করেছি আমরা। ওঃ চিন্ময় মূর্তিতে কলিমা লেপন করেছি আমরা, অথচ হিসেব-নিকেশের কারচুপিতে আইনের কবল থেকে মুক্ত। আশ্চর্য !

বাইরে জানিয়ে দেওয়া হলো মুকুল সর্বাধিকারী অসুস্থ। ডাক্তারের অভিমত অনুযায়ী কারও সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর। গোপনে টেলিফোনের লাইন কেটে দিলে রামগোপাল। যখন তখন যাকে তাকে ফোন করে কেবল জ্বালাতন করে, 'শুনছেন ? টাকার রং লাল—না-না কালো নয় ! কি একমত ? হাসছেন যে ? না-না কালো টাকা বললে চলবে না। নাঃ, দুঃখিত ! আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।—তবে আমি জানি টাকার রং লাল !'

পাগলও ভাবে। মুকুলও প্রায় সময় নানা বিষয় নিয়ে ভাবনার অতল সাগরে তলিয়ে যায়। অদ্ভুত সে ভাবনা—অন্ততঃ তার মত মানুষের।

লোভ আর হিংসা যখন মানুষের সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে গ্রাস করে, তখন তার এমনই পরিবর্তন হয় যে, তাকে আর মানুষ বলে চেনা যায় না। কিন্তু কত অমানুষও উচ্চ শিখরে বসে নিজেকে মানুষ বলে চীৎকার করে। দরিদ্র-নিরীহ-মূর্খ মানুষও তাদের মানুষ বলেই ভুল করে, বুঝতে পারে না সব সময় আসল মানুষ কবে ছাইচাপা পড়ে গেছে লোভ আর হিংসার আগুনে। তারা অর্থের দাসত্ব করে—মনুষ্যত্বের নয় !

পারুল খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, 'রাত-দিন কেবল বিড়বিড় করে বকছো আর হো-হো করে হাসছো—এও দেখতে হচ্ছে আমাকে। হায় অদৃষ্ট—হায় বিধাতার লিখন !'

'তুমি আজ যা' নিয়ে ব্যথা পাচ্ছো—অথচ যা' কোনদিন ভাবনি, আমিও তেমনি এ অনাগত দিনের কল্পনাও কি কোনদিন করতে

পেরেছিলাম? নিজেকে এতদিন রাহুগ্রাসে জড়িয়ে ফেলেছিলাম পারুল, যদিও তার প্রধান কারণ আমার দারিদ্র। তবে কি দরিদ্র হঠাৎ ধনী হলে এই অবস্থাই হয়? তবু আজ আমার মনে হয়, সব পেয়েও আজ আমি সব ত্যাগে প্রস্তুত। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবো দেশের মানুষের কল্যাণে। অগ্নিপরীক্ষা ত হয়ে গেছে, এবার স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে যাবো। বড় কষ্টে জোটানো দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন—যা' আমার অমৃত বলে মনে হয়, সেই পর্ণকুটির—আমার সে বেদনার্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা, অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেই বেঁচে থাক। কি হবে এসব নিয়ে? কি করলাম জাল-জুয়াচুরির ব্যবসা করে? কেবলমাত্র জটিল মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে জীবন নিয়ে সংশয়ে পড়লাম। একদিন জীবিকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আজ জীবন নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুঁজছি শান্তির পথ।'

॥ একুশ ॥

ঢকঢক করে একটা বোতল শেষ করে ফেলে মুকুল।

পারুল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'এখন খাবার সময় এসব কেন খাচ্ছো? কে এনে দেয় তোমাকে এসব?—গোপাল আমাকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছে—এসব খেয়ে মন মেজাজ কি আরও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ছে না?'

'বাকী আছে কিছু? তবু যন্ত্রণার শেষ নেই পারুল। তুমি বুঝবে না, সর্বদা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে মনটা। গোপাল মাঝে মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারের পরামর্শ নিতে আসে, ফিরিয়ে দিই তাকে। বলি তাকে—তোমার বুদ্ধি বিবেচনামত চলো, আমি আজ শুধু মুকুল সর্বাধিকারী, নকল কারবারী নই। যদি তুমি এতে তৃপ্তি পাও করো, না করো ছেড়ে দাও। আমি এসবের মধ্যে আর নেই। প্রয়োজন হলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পথের ভিখারী হয়ে দিন কাটাবো। বিষয় নয়, বিষ—বিষ—মরণ বিষ!'

গোপাল বলে, 'বাবার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। আমি তাঁর কোন কথাতে রাগ করি না মা, তুমিও যেন কিছু বলো না বাবাকে।'

'হ্যাঁ, মাথা খারাপই হয়েছে পারুল! অর্থলালসা-কাতর তোমার ছেলে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি এসব ছাড়তে পারে?'

বৌমা কিন্তু প্রতিদিন তোমার খোঁজ নিচ্ছে টেলিফোনে।—বড় ভাল মেয়ে! এ সময় কেসটা 'উইথ ড্র' করলে ভাল হতো না কি?'

'না। তবে জানি মেয়েটা খুবই ভাল। অবশ্য গোপাল একদিন কঠোরতম আঘাতের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ পাবে নিষ্ঠুরতম সত্যের। যেমন আজ আমি নকল জীবনের অহংকারে অকস্মাৎ আগত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছি। আজ যে অট্টালিকায় বসে কথা বলছি, তা'

আমার তৈরী বলে অহংকারের কিছু নেই—এসব সর্বসাধারণের। তাদের রক্ত জল করা শ্রমের বিনিময়ে, সে আমি যে ভাবেই রোজগার করি না কেন! আমাদের সেদিনের সে-নির্মমতা, হৃদয়ের ব্যর্থতার কাছে বার বার ক্ষমা চাচ্ছে সবিনয়ে।

'মনের অনুশোচনা কি প্রায়শ্চিত্তের সাহায্যকারী নয়?'

'হতে পারে! জীবনটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে কি পেয়েছি জান?—উদ্‌ভ্রান্তি আর লক্ষ্যহীনতা। পবিত্র ভারতের শাশ্বত নীতি-জ্ঞান, মূল্যবোধ যতগুলি মানুষের কাছ থেকে পারি, ছিনিয়ে নেবার জন্যই বুঝি আমি জন্মেছিলাম। কি হাস্যকর ব্যাপার, সেই নকল আমি আসল বলে বহু মানুষের কাছে নমস্য হয়ে থাকলাম। তারা জানলে না আমার ভেতরটা কিসে তৈরী! এরপর হয়ত একদিন ক্যালেণ্ডারের পাতায় ছবি দেখবে আমি খাঁটি ব্যবসায়ী হিসাবে ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছি। মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা ভেবে অবাঞ্ছিত আনন্দ স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন ভেবেছিলাম একদিন। আজ মনে হচ্ছে, এ জীবন জীবন নয়। পিপীলিকাও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে নিজের জন্য—দলের জন্য। আমি আমার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করেছি—বিরাট কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে—এতে মনুষ্যত্বের বাহাদুরী কোথায়? সবলের ক্ষুধায় জীর্ণ হচ্ছে দুর্বল মানব সমাজ!'

পারুল অধীর হয়ে ওঠে মুকুলের আপন মনে বকবকানি শুনে। কোন সময়ে ছলেবলে ঘুমোবার আবেদন জানায়, কোন সময়ে আবার অন্য কথা বলে ভুলাতে চায়, মুকুল কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে আপন মনে বকে চলে।

'প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি আর তা' প্রত্যক্ষ করি। সে রোমহর্ষক বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করতেও যেন বেদনাক্লিষ্ট প্রাণ আঁতকে ওঠে ভয়ে। তাই বলছিলাম, এ এক কলঙ্কিত জীবন আমার। আমাদের মসীমাখা ঘৃণিত জীবনের জন্য বহু শান্তিপূর্ণ

সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুদূর অতীতের স্বপ্নময় জগৎ বলে যা' আমরা মনে করি, তার সঙ্গে আজকের দিনের বহু তফাত। তবু সে দারিদ্র ভাল ছিলো, অন্ততঃ এমন দুশ্চিন্ত ভীতি সঙ্কুল জীবন যাপন করতে হতো না। সেদিনের সুন্দর ছন্দময় জীবনের স্বাদ আর কোন প্রকারেই ফিরে পাওয়া যাবে না অথচ পল্লীর সেই সহজ জীবন যাপনের দিনগুলো আজও আমাকে প্রলুব্ধ করে। পয়সার জন্য কি না করেছি আমি? এইযে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেল, পেলামও অনেক কিছু—কিন্তু যা' অন্তরের একান্ত কামনা, 'শান্তি' তা পেলান না।

পারুল বলে, 'এ তোমার মনের অনুতাপ! এমনি করে কেউ কি ভাবে কৃতকর্মের জন্য? ওগো, তুমি যাতে শান্তি পাও—পাগলামি ভাল হয়ে যায়, তাই করো, রাতদিন বকবকিয়ে লাভ কি?

'লাভের কথা নয়, লোকসানের কথাই ভাবছি পারুল। হয়তো এভাবেই আমার বাকী জীবনটা প্রায়শ্চিত্তের জন্য উৎসর্গীকৃত হবে। তবে তুমি সময় থাকতে গোপালকে বলে দিও, আমি তার জীবন-যাপনের জন্য এ বাড়ী ভাড়ার আয় ছাড়া সব কিছু দেশের জন্য দান করে দেবো। শুনেছো বোধহয়, উইলের কাগজপত্র প্রস্তুত হচ্ছে!'

আঁতকে ওঠে পারুল। বলে, 'না-না, সে তুমি করতে পারবে না। ছেলেটা যেভাবে মানুষ হয়েছে তাতে তার বাড়ী ভাড়ার আয়ে চলবে না—চলতে পারে না।'

'না চলে শুকিয়ে মরবে। দেশের কোটি কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্রের জ্বালায় আত্মাহুতি দেবে, আর তোমার গোপাল আলালের ঘরের দুলাল হয়ে থাকবে, সে আমি কল্পনাও করতে পারি না। না-না তুমি বাধা দিও না। বলেও কাজ নেই বরং এখন তাকে, পাগল বলেই জানে আমাকে—সব কাজ চুকে গেলে বরং নিজেই জানতে পারবে, যখন তার আর কিছু বলার থাকবে না, নীরব থাকতে বাধ্য হবে।

'তোমার এ মত আমি কিন্তু অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারছি না। না-না, সে খুব অন্যায় হবে। বরং লাখ খানেক টাকা দান করতে পারো কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে।

একটা জরুরী কাজে পিতার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে গোপাল এসেছিলো। সে ঘণ্টাখানেক ধরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, পিতার মনের শেষ ইচ্ছার কথা কানে আসতেই সে থেমে গেছে। এ কি বলছেন বাবা? তবে কি মিষ্টার সোম গোপনে যে কথা কাল বলেছেন তা' সর্বৈব সত্য! সে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা' ঘটতে পারে মনে করে আন্দাজে সব ঠিক রেখেছে, তা' ধ্রুবসত্য হতে চলেছে!

মরিয়া হয়ে ঘরে ঢোকে গোপাল। 'আমার নীরবতার আগে তোমাকেই চুকিয়ে দিই শয়তান। তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হতে দেবো না। ভেবেছো, সব রোজগার তোমার? আমি কি কম পরিশ্রম করছি ব্যবসাটা খাড়া রাখবার জন্যে? পাগলামির ভান করে ঘরে বসে আছো ছ'-সাত মাস। মানলাম তুমি পাগল, কিন্তু আমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার বুদ্ধি পাগলামির লক্ষণ নয়— এ তোমার বিরাট অভিসন্ধি।'

পারুল বলে, 'পৃথিবীতে পাগল বহু প্রকারের আছে গোপাল।'

মুকুল আর্দ্র কণ্ঠে বলে, 'গোপাল তুই বুঝবি না আমার বর্তমান মনের অবস্থা। অন্তর কি চায় আমার। ওরে! সত্যি বলছি, টাকার রং লাল, একটা টাকাও কালো নয়—কালো হয় কেবল আমাদেরই কলুষিত মনের কদর্য ব্যবহারে। আমি জানি টাকার রং লাল। স্বার্থ আর অর্থই মানুষের যত অধঃপতনের মূল।'

সহসা মুকুলের বুক লক্ষ্য করে গোপালের রিভালভারটা গর্জে ওঠে দুবার।

পারুল চিৎকার করে ওঠে, 'এ তুই কি করলি গোপাল—ওরে হতভাগা—' অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে সে।

বিছানার ওপর বসেছিলো মুকুল। এবার ঢলে পড়ে। বুকের

ওপর গড়িয়ে পড়া রক্তধারাটা ডান হাত দিয়ে অলস হাতে মুছতে মুছতে বলে, 'ঠিক আমার বুকের এই তাজা রক্তের মত—প্রতিটি টাকা-পয়সা লাল। আমি বুঝতে পেরেছি টাকার রং লাল, জীবন দিয়ে আজ তা' আরও গভীরভাবে অনুভব করলাম'।—চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে মুকুল।

পারুলের মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে খাড়া করে তোলে গোপাল। বলে, 'মা, তুমি কিচ্ছুটি বলতে পারবে না, অনেক ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি কিছু ভেবো না। টাকার জোরে আমি সব কিছু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। জান তো, আমি প্রসিদ্ধ ভেজাল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—রামগোপাল সর্বাধিকারী, আমিও সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

'হয়তো তাই সত্য গোগাল, কিন্তু আমি আজ বুঝতে পারলাম টাকার রং লাল—একদিন তুইও বুঝতে পারবি। যত কালো আমাদের মন। কিন্তু আমি ক্ষমা করলেও, কাল আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। কালের মানুষও না।

মুহূর্তে পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শহরময় এ খবর ছড়াতে দেরি হয় না।

—)০(—